শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

‘ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে ভয়,উদ্বেগ এবং মানসিক চাপমুক্ত একটি পরিবেশ গড়ে তুলুন’

সংবাদ সংকলন : স্কুলে শাস্তির বিরুদ্ধে এবার সরব প্রধানমন্ত্রী। গত ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে স্কুলে দৈহিক ও মানসিক শাস্তির বিরুদ্ধে সরব হলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও। তিনি বলেছেন, শিক্ষার অধিকারকে পুরোমাত্রায় কার্যকর করতে স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভয়মুক্ত আবহাওয়া তৈরি করা প্রয়োজন। শিক্ষক দিবসের প্রাক্কালে দেশের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ধর্ম, জাতি বা লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনও ছাত্রছাত্রীই যেন স্কুলে যাওয়ার কথা শুনলে ভয়ে কেঁপে না ওঠে।

সমযাত্রা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১০

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

শিক্ষার অধিকার আইন বলবৎ করতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার

সংবাদ সংকলন : গত ২৯ সেপ্টেম্বর মহাকরণে রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী শহরের ৫৭টি বেসরকারি স্কুলের প্রতিনিধিদের সাথে এক বৈঠকে জানিয়েছেন, শিক্ষার অধিকার আইন মোতাবেক রাজ্যের সব বেসরকারি স্কুলে অন্তত ২৫ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণির পড়ুয়া ভর্তি করতে হবে। সেইসব পড়ুয়ার পড়াশুনার খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, রাজ্যে এই আইন বলবৎ করার জন্য সময় রয়েছে তিন বছর।

বেসরকারি স্কুলকর্তারা অবশ্য জানিয়েছেন, সরকারের এই সিদ্ধান্তে আদতে বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকদের উপরেই চাপ বাড়বে। কারণ, রাজ্য সরকার সরকারি স্কুলে পড়ুয়া পিছু যা খরচ করে থাকে সেই পরিমাণ টাকাই বরাদ্দ করবে বেসরকারি স্কুলের এইসব অনগ্রসর পড়ুয়াদের জন্যও। কিন্তু তা বেসরকারি স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলে মনে করেন বেসরকারি স্কুলকর্তারা। এক বেসরকারি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের কথায়, ‘বেসরকারি স্কুলে পড়ার খরচ বেশি। বছরে ২৫-৩০ হাজার টাকা। কিন্তু সরকার বলছে ছাত্র পিছু সাত থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা বছরে দেবে। তাহলে বাকী টাকাটা এই স্কুলগুলো কোথা থেকে পাবে? এই বিষয়টা নিয়েই আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছি। মামলার রায় যদি আমাদের পক্ষে যায়, তাহলে ভালো। না-হলে রাজ্যের নির্দেশ আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের উপর চাপ বাড়বেই।’

রাজ্যে নয়া স্কুল চালুর উদ্যোগ

সংবাদ সংকলন : রাজ্য সরকার রাজ্যে ১২০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়তে উদ্যোগী হয়েছে। গত ৯ সেপ্টেম্বর মহাকরণে এক বৈঠকে এজন্য জেলাশাসকদের উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। রাজ্যের স্কুলশিক্ষা দফতরের সচিব বিক্রম দেন জানিয়েছেন, আরও ৫৬০০টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ারও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। তার মধ্যে অনুমোদিত হয়েছে ৩২০০টি। ইতিমধ্যেই ২১০০টি স্কুল চালু করা গিয়েছে। বাকী ১১০০টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার জন্যও জায়গা দেখতে মুখ্যসচিব এদিন জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

অনাথ বাচ্চাদের পুনর্বাসনে রাজ্যের নয়া উদ্যোগ

সংবাদ সংকলন : রাজ্যের সরকারি- বেসরকারি হোমে এমন বহু ছেলেমেয়ে রয়েছে, যাদের বাবা-মায়ের খোঁজ নেই। এইসব ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক জীবনে বেড়ে ওঠার সুযোগ করে দিতে তাদের জন্য পালক বাবা-মা খুঁজছে রাজ্যের সমাজকল্যাণ দফতর। ইতিমধ্যে কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র এই কাজে অনেকটা এগিয়েছে। তাতেই উৎসাহ পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।

স্কুলে স্কুলে শাস্তি চলছেই

অনেক আলাপ-আলোচনা ও কর্ম-বিতর্কের পরেও স্কুলপড়ুয়ারা যে শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায়নি নিচের সংবাদ শিরোনামগুলি তার প্রমান -

- ছাত্রীর মাথায় ডাস্টারের বাড়ি, শিক্ষকদের মারপিট গাইঘাটায় - **আনন্দবাজার পত্রিকা ০৫.০৯.১০**
- দুই স্কুলে শিক্ষকের মার, হাসপাতালে পড়ুয়া - **আনন্দবাজার পত্রিকা ০৯.০৯.১০**
- স্কুলের মধ্যে মোবাইলে কথা, ছাত্রকে বেদম মার শিক্ষকের - **একদিন ২৬.০৯.১০**
- খাবার চাওয়ার ‘অপরাধে’ বেদম প্রহার, বহিষ্কৃত দুই পড়ুয়া - **একদিন ২৭.০৯.১০**
- Schoolgirl 'thrashed' over extra fee - **The Telegraph 08.10.10**
- শারীরিক শাস্তির অভিযোগ স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে - **আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১.১০.১০**

জানেন কী?

শিশুদের শারীরিক শাস্তির ক্ষেত্রে আর্থিকমূল্য বিচারে বিশ্বের তেরোটি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয় - প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের সমীক্ষা।

সমীক্ষা থেকে আরও জানা গেছে, ভারতে ৬৫ শতাংশ শিশুই স্কুলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার।

সরকারি বিজ্ঞাপন

শিক্ষার অধিকার আইন বলবৎ হবার পরেও স্কুলে শাস্তি চলছেই

■ ওয়েবেন কার্যক্রম ■

আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ

গত ৮ আগস্ট কোলকাতার সেবা কেন্দ্রে ওয়েবেন ও নাফরে জন আন্দোলনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত একটি কর্মশালায় আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী জেলায় জেলায় উক্ত সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই যেসব জেলায় আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির রিপোর্ট নিচে দেওয়া হল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : গত **২৫ আগস্ট** দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দক্ষিণ গোবিন্দপুর নারায়ণীতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদর্শ বিদ্যালয় গঠন নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান, মাতা-শিক্ষক কমিটি ও ওয়েবেন-এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা থেকে জানা যায় ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে (১৬ নভেম্বর, ১৯৭১) প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, ১ জন পার্শ্ব শিক্ষক ও একজন ভি. আর. পি. আছেন। বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩৬। ২৫ অগস্ট তারিখে উপস্থিত ছিল ১১৮ জন। বিদ্যালয়ে মোট ৩ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু আছে। এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত মিড-ডে-মিল দেওয়া হয়। এই গ্রামে ২ জন স্কুলছুট ছাত্র আছে। একজন নিজেদের দোকানে কাজ করে। স্কুলছুটের কারণ অভিভাবক ও ছাত্রের নিজের কোনো আগ্রহ নেই। আরেকজন দারিদ্রের কারণে বর্ধমান জেলায় হিমঘরে কাজ করে।

বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উপস্থিত মাতা-শিক্ষক কমিটির সদস্যরা ইতিবাচক মত প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ে একটি দেওয়াল পত্রিকা আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার আছে। খেলার মাঠ ২৫ আগস্ট তারিখেই রেজিস্ট্রেশন হবার কথা ছিল।

আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ বিষয়ে ওয়েবেন ও নাফরে জন আন্দোলন-এর ভূমিকা আলোচনা করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। সকলেই জানান প্রধান শিক্ষকের ওপর অন্যান্য কাজের দায়িত্ব বেশি হওয়ায় বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। একজন করণিকের বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষকদের নির্বাচন ও জনগণনার কাজে যুক্ত হতে বাধ্য হওয়ায় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন। শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হিসেবে এই বিদ্যালয়ে আরও শিক্ষকের প্রয়োজন।

প্রধান শিক্ষক প্রভাত কুমার দাস উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টায় রত আছেন বলে গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান কমলেশ সিংহ এবং মাতা শিক্ষক কমিটির সদস্যরা মত প্রকাশ করেন। গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান বিদ্যালয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাঁদের সাথে বিদ্যালয়ের সমন্বয় সাধনের কাজ নিয়মিত করা হয় বলেও গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রধান মত প্রকাশ করেন।

আদর্শ বিদ্যালয়ের সূচকের প্রেক্ষিতে যে সব বাধা বা সমস্যা আছে তা আলোচনার জন্য এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য **১৮ সেপ্টেম্বর,** পরবর্তী সভার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মালদহ : জেলায় আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে নির্বাচিত বীরনগর শিমূলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (বৈষ্ণবনগর চক্র, খেজুরিয়া ঘাট) গত **১৬ আগস্ট** একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে স্থাপিত বিদ্যালয়টিতে খেলার মাঠ সহ বিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমাণ ৯৯ শতক। সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকপ্রণবানন্দ চ্যাটার্জী এদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছিলেন। তার সাথেও প্রাথমিক কথা হয়। রাজ্য আহ্বায়ক সুবীর দে ১০০ শতাংশ ভর্তি সুনিশ্চিত করার কথা বলেন। এদিনকার সভায় গ্রাম শিক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন না। প্রধানশিক্ষক শংকর কুমার বিশ্বাস সহ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সহকারী শিক্ষক আব্দুল কাদের জিলানী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রাথমিকভাবে আদর্শ বিদ্যালয় কর্মশালার সিদ্ধান্তগুলি আলোচনা করা হয়। প্রধানশিক্ষক জানান, আগে এই বিদ্যালয়ে ৪০০ থেকে ৪৫০ জন ছাত্র ছিল। গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে এবং একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র গঠনের ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী চলে গেছে। বর্তমান চারটি শ্রেণি মিলিয়ে মোট ৯৬ জন ছাত্র-ছাত্রী আছে। প্রাথমিক আলোচনার পর প্রধানশিক্ষক কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

১. আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনার জন্য ওপর থেকে কোনো নির্দেশের প্রয়োজন আছে কিনা ?
২. একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার জন্য অভিভাবককে বোঝাতে হবে, কি করে বোঝাবে ?
৩. সকল শিশুর পোশাক এক হওয়া দরকার, কিন্তু তা না হওয়ায় সমস্যা হয় ? কিভাবে দূর করা যায় ?
৪. খাদ্য সমস্যা আছে, এখানে বেশিরভাগ পরিবারের স্ত্রীরা বিড়ি বাঁধে। স্বামীরা ঘুরে বেড়ায়, এক বেলা রান্না হয়। ফলে বিদ্যালয়ে আসার পর রান্নার জন্য অপেক্ষা করে, খাওয়া হলেই আর ধরে রাখা যায় না। কি করা যায় ?
৫. আর্থিক সমস্যা রয়েছে, আপনাদের ফান্ড আছে কিনা ?

রাজ্য আহ্বায়ক সুবীর দে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে পরবর্তী সভায় গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। পরবর্তী সভা **৭ সেপ্টেম্বর,** বেলা ২ টায় অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক করা হয়।

পূর্ব মেদিনীপুর : গত **৯ সেপ্টেম্বর** তারিখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুন্দরনগর বিবেকানন্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সভা অনুষ্ঠিতহয়। এই সভায় ১২ জন অভিভাবক, এম.টি.এ, এস.এল.এম.সি. ও এস.এইচ.জি. প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এ ৩ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ওয়েবেনের রাজ্য প্রতিনিধি তথা জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক সমর বরন মান্না ও জেলা প্রতিনিধি অজিত কুমার সাউ।

সভায় ওয়েবেনের নীতি-আদর্শ ও আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনার পর সকলের সহযোগিতা ও নিজ নিজ ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। অভিভাবকদের পক্ষ থেকে শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি অভিযোগ করে বলা হয় যে, শিক্ষক মহাশয়রা ঠিক সময়ে স্কুলে আসেন না। মিড-ডে-মিল মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে। মিড-ডে-মিল-এর গুণগত মান ভালো হয় না ইত্যাদি। শিক্ষক মহাশয়রা এইসব অভিযোগের জবাবে বলেন যে, বিষয়গুলি সম্পর্কে তাঁরা সচেতন থাকবেন। তারপর পঞ্চায়েত প্রতিনিধি শ্যামলী সিং ও স্বনির্ভর গোষ্ঠির প্রতিনিধি কৃষ্ণা বেরা সভায় বলেন, এইসব অভিভাবকরা স্কুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন না। ফলে তাদের কাছে খবরগুলি ঠিকঠিক থাকে না। তিনি স্কুলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা ও স্কুলের উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা করার জন্য আবেদন রাখেন।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করা হয়। জানা যায় স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের আলাদা আলাদা শৌচাগার নেই, খেলার মাঠ নেই, খেলার উপকরণ নেই।

স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোচনায় স্কুলের বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা উঠে আসে। যেমন - বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, প্রত্যেকটি শ্রেণির জন্য আলাদা ঘর নেই, রান্নার ঘর আছে তবে সেটাও খুব ভালো নয়, অফিস ঘর নেই ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা স্কুলে অনিয়মিত। এই স্কুলে মোট ৩ জন শিক্ষক আছে। শিক্ষক মহাশয় বলেন আজ ৬০-৬২ জন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে উপস্থিত আছে। স্কুলের নিজস্ব জমির পরিমাণও খুব কম।

উত্তর দিনাজপুর : গত **১৩ সেপ্টেম্বর** উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিলীপ সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগ নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ৭ জন অভিভাবক ও এম.টি.এ. প্রতিনিধি সহ ৩ জন শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে জেলা প্রতিনিধি সনজিৎ দাশ মহাশয় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ এবং মডেল স্কুল নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, উত্তর দিনাজপুর জেলার দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ওয়েবেনের সহযোগীতায় মডেল স্কুল হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। একটি হেমতাবাদ ব্লকে এবং আর একটি এই স্কুলটি। এই স্কুলকে মডেল স্কুল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য গ্রামের সকল মানুষের, শিক্ষকদের, রাজনৈতিক নেতাদের ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের সহযোগীতা ও আন্তরিকতা একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি জানান।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপেন ঘোষ মহাশয় বলেন, উত্তর দিনাজপুর জেলায় সরকার পরিচালিত ১৪৫২টি বিদ্যালয় আছে। এগুলির মধ্যে একক শিক্ষক পরিচালিত স্কুল আছে, দু'জন শিক্ষক পরিচালিত স্কুল আছে। অথচ শিক্ষা অধিকার আইনে বলা হয়েছে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হবে ৩০:১, ওয়েবেন মনে করে প্রত্যেকটি শ্রেণির জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যিক। ছাত্রছাত্রীদের পোশাক, বইপত্র, খাতা, কলম এবং মিড-ডে-মিল সরকার নিয়মিত সরবরাহ করবে। সেই কারণে সকলকে সংঘবদ্ধভাবে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারী শিক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে ওকালতি (Advocacy) করতে হবে।

জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক চিরঞ্জীব মজুমদার মহাশয় উপস্থিত অভিভাবকদের অনুরোধ করেন অন্যান্য অভিভাবকদের আজকের সভার বিষয়গুলি জানানোর জন্য। তিনি শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করেন স্কুল তাদের কাছে কীভাবে আকর্ষণীয় হতে পারে। তারা জানায়, তাদের খেলার মাঠ নেই, খেলার জিনিস নেই (যেমন বল) গরমের সময় খুব কষ্ট হয়, বিদ্যুৎ নেই, বসার জন্য বেঞ্চ নেই, এসব হলে তাদের পক্ষে ভালো হয়।

সবশেষে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় জানা যায়, স্কুলে মোট ছাত্র সংখ্যা ২৭৭ জন। গড় উপস্থিতি ৫০ জন। মোট শিক্ষক ৫ জন। প্রধান শিক্ষক বিকাশ সরকার মহাশয় বলেন, ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত স্কুলে আসে না, অভিভাবকরাও কোনা উদ্যোগ নেন না। তিনি আরও বলেন ওয়েবেনের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত গত সভায় (৮ আগস্ট) আদর্শ বিদ্যালয়ের যেসব সূচক নির্ধারণ করা হয়েছিল তার অনেকগুলি এই স্কুলে নেই, যেমন - ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগার, পাঁচিল, প্রত্যেকটি শ্রেণির জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ, মিড-ডে-মিল এর রান্নাঘর ইত্যাদি।

পরিকল্পনা

১) সব ছাত্রছাত্রীরা যাতে নিয়মিত স্কুলে আসে তার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচার করা
২) গ্রামের ৬-১৪ বছরের সব ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি করার জন্য যারা স্কুলে যায় না তাদের চিহ্নিত করা ও বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার করা এবং স্কুলে ভর্ত্তির ব্যবস্থা করা
৩) শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে গ্রামসংসদের সভায় আলোচনা করা
৪) বিদ্যালয় পরিকাঠামোর বিষয়গুলি (শ্রেণিকক্ষ বাড়ানো, পাঁচিল তৈরি, বসার জন্য বেঞ্চ, বিদ্যুৎ সংযোগ, রান্না ঘর তৈরি করা ইত্যাদি) নিয়ে সরকারী আধিকারিকদের (SI, BDO, SDO, DI, সভাপতি, শিক্ষা কর্মধক্ষ্য ইত্যাদি) সঙ্গে ওকালতি করা।

মালদহ : গত **১৫ সেপ্টেম্বর** জেলার কালিয়াচক ৩নং ব্লকের বীরনগর সিমুলতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহঃ আব্দুল কাদের জিলানী মহাশয়ের সভাপতিত্বে আদর্শ বিদ্যালয় গঠন নিয়ে একটি সভায় ২৩ জন অভিভাবক ও এম.টি.এ. প্রতিনিধি সহ ৪ জন শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় একজন শিক্ষক প্রতিনিধি বলেন, তাদের স্কুলে মোট ৯৬ জন ছাত্র ও ৫ জন শিক্ষক আছে। অভিভাবকরা শিক্ষক মহাশয়দের কোনো সহযোগীতা করেন না। কেবলমাত্র মিড-ডে-মিল কম হলে, খারাপ হলে বা যদি কোনো দিন বন্ধ থাকে তবেই কিছু খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করেন। ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত স্কুলে আসে না। যখন খেতে দেওয়া হয়, তখন অনেক ছেলেমেয়ে হাজির হয়। এটা একটা বড় সমস্যা।

অভিভাবকরা বলেন তাদের ছেলেমেয়েরা কোনো সুযোগসুবিধা পায় না। যেমন - সংখ্যালঘু ভাতা, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি। তারপরেই সব অভিভাবক মিড-ডে-মিল বিষয়ে অনেক অভিযোগ করতে শুরু করেন।

মডেল স্কুল বলতে কি বোঝায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করার পর অভিভাবকরা প্রস্তাব দেন - প্রত্যেক মাসে সব অভিভাবকদের নিয়ে সভা করতে হবে এবং সব ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, **১৯ সেপ্টেম্বর** সকলে (শিক্ষক ও অভিভাবক) সম্মিলিত ভাবে এম.টি.এ. ও এস.এল.এম.সি. সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করে স্কুল পরিকল্পনা তৈরি করা হবে। প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে গত ১৬ আগস্ট একই বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্ধমান : গত **৬ অক্টোবর** জেলার পূর্বাঞ্চলী ২নং ব্লকের হালদি নোয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহঃ মোজাফফার আহেমদ মহাশয়ের সভাপতিত্বে আদর্শ বিদ্যালয় গঠনের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ২৩ জন অভিভাবক, ভি.ই.সি. ও এম.টি.এ. প্রতিনিধি সহ ৪ জন শিক্ষক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনার শুরুতে অরুন সাই মহাশয় মডেল স্কুলের সূচকগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তারপর প্রধানশিক্ষক মহঃ আবু তায়েব সাহেব বলেন, তাদের স্কুলে মোট ২১২ জন ছাত্র (১০৩ জন ছেলে ও ১০৯ জন মেয়ে) ও ৬ জন শিক্ষক আছে। অভিভাবক ও শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে যোগাযোগ ভালো। চারটি শ্রেণির জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ আছে। শিক্ষকদের জন্য আলাদা অফিস ঘর আছে। শ্রেণি কক্ষগুলির দেওয়ালে শ্রেণি অনুযায়ী পাঠ্য বইয়ের ছবি, ছড়া সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। পাঁচিল ঘেরা স্কুলটির সামনে বাগান আছে। স্কুল ছাত্রছাত্রীদের গড় উপস্থিতি প্রায় ৯৫ শতাংশ এবং ওই গ্রামের স্কুলছুট শিশু প্রায় নেই।

স্কুলে সমস্যাগুলি হল :

১। প্রধানশিক্ষক ছাড়া আর সব শিক্ষক নতুন (এ বছরে নিযুক্ত হয়েছে) আর তারা সবাই অনেক দূর থেকে আসেন
২। স্কুলে যাওয়ার রাস্তার অবস্থা ভালো নয়
৩। স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই
৪। খেলার মাঠ ও যথেষ্ট পরিমাণ খেলার সরঞ্জাম নেই
৫। কমন রুম ও লাইব্রেরি নেই, তবে বই আছে
৬। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই।

এরপর বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু হলে অরুন সাই মহাশয় প্রস্তাব দেন বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এই সময়ের মধ্যে শেষ হবে না। বরং বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনাটি তৈরি করে ওয়েবেন অফিসে একটি কপি পাঠানো হবে। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী সভাপতি মহাশয় সকলের মতামতের ভিত্তিতে বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনাটি তৈরি করে ওয়েবেন অফিসে একটি কপি পাঠানোর আবেদন জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

■ ওয়েবেন : সাংগঠনিক রিপোর্ট ■

মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক
জেলা কার্য্যনির্বাহী পরিষদের সভা

গত **২১ সেপ্টেম্বর** অনুষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলার কার্যনির্বাহী সমিতির সভার আলোচনার মূল বিষয় ছিল পোষ্টকার্ড ক্যাম্পেনিং ও সহিসংগ্রহ। শিক্ষা অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও শিশু সুরক্ষা কমিশন গঠনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানোর জন্য এই কার্যক্রম। সিদ্ধান্ত হয় **২৪ সেপ্টেম্বর** তারিখের মধ্যে পোষ্টকার্ডগুলি লেখা সম্পন্ন করে ও সহি সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া সভায় গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১) **২২ সেপ্টেম্বর :** পড়াশোনার মান উন্নয়ন মিড-ডে-মিল ও শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে SLMC, MTA, SHG ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা সভা, স্থান - সাগরদিঘী বিনোদ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাগরদিঘী।

২) **২২ সেপ্টেম্বর :** ব্লকস্তর পাঠচক্র, বিষয় - শিক্ষা অধিকার আইন, স্থান : সাগরদিঘী বিনোদ প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাগরদিঘী।

৩) **২৫ সেপ্টেম্বর :** ব্লকস্তর পাঠচক্র, বিষয় - শিক্ষা অধিকার আইন, স্থান : কালিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাণীনগর-২

৪) **০৩ অক্টোবর :** ব্লকস্তর পাঠচক্র, বিষয় - শিক্ষা অধিকার আইন, স্থান : কালিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাণীনগর-১

৫) **০৯ অক্টোবর :** জেলাস্তর পাঠচক্র, বিষয় - শিক্ষা অধিকার আইন, স্থান : বহরামপুর, মুর্শিদাবাদ

হুগলি জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক
কার্য্যনির্বাহী কমিটির সভা

গত ২০ **অক্টোবর** মাখলা মুক্তধারা-তে হুগলি জেলা এডুকেশন আর্ট নেটওয়ার্কের একটি সভা আয়োজিত হয়। ওইদিনের সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জেলা কমিটির পুনর্গঠন ও ২০১০-২০১১ সময়কালের জেলার ও ব্লকস্তরের পরিকল্পনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ। এই জেলা কমিটির বেশ কিছু সদস্য অনিয়মিত হয়ে যাওয়ায় জেলা কমিটির পুনর্গঠন করা। বর্তমান কমিটিতে ১৩ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এর অন্যতম উদ্দেশ্য জেলা কমিটিতে কিছু সম্পদ-ব্যক্তির সংযোজন। পূর্ববর্তী জেলা আহ্বায়কদ্বয় পদত্যাগ করায় কমিটির পক্ষ থেকে দু'জন নতুন আহ্বায়কও নির্বাচন করা হয়। এঁরা হলেন শ্রী কৃষ্ণ ছল ও রুকসানা মন্ডল। জেলার পক্ষ থেকে এদের রাজ্য কার্য্যনির্বাহী কমিটিতেও যুক্ত করা হয়। জেলা সম্পাদকমন্ডলীতে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ওয়েবেনের বর্তমান বছরের পরিকল্পনা অনুসারে জেলা ও পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক
সম্পাদকমন্ডলীর সভা

গত ২৯ **অক্টোবর** মহঃ খিদিরবক্স-এর সভাপতিত্বে মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা ভাঙন অ্যাকশন প্রতিরোধ নাগরিক কমিটির কার্য্যালয়ে। সভায় ইংলিশ বাজার, মানিকচক, কালিয়াচক-২ এবং কালিয়াচক-৩ এই চারটি ব্লাকের মোট ১১ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কালিয়াচক-২ ব্লকের কাজ সম্পর্কে রাজ্য আহ্বায়ক রুহুল আমীন জানান, পূর্ববর্তী ব্লক মিটিং-এ রাজ্য সঞ্চালক তৌফিকুল হাসান-এর উপস্থিতিতে বাৎসরিক পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। তিনটে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সাথে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া এস. আই. এবং বিডিও-র সাথে ওয়েবেন-এর কাজ নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। রাজ্যে শিক্ষা অধিকার আইন প্রয়োগের জন্য রাজ্য নিয়মাবলী ও এস.সি.পি.সি.আর গঠনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠানো হয়।

কালিয়াচক-৩ ব্লকের কাজের রিপোর্ট সম্পর্কে জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক অখিল মন্ডল বলেন, পোস্টকার্ড ক্যামপেইন, হ্যান্ডবিল প্রচার, পোস্টারিং ছাড়াও অভিভাবকদের নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করা হয়। সেখানে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা হয়। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সাথে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

মানিকচক ব্লকের প্রতিনিধি জানান, পোস্ট কার্ড ক্যামপেইন করা হয়েছে। একটি ব্লক মিটিং করা হয়েছে। সমপথ-এর স্থায়ী গ্রাহক করা হয়েছে ১২ জনকে। একটি সয়ম্ভর গোষ্ঠীর সাথে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা হয়। শিশুদল গঠন করার জন্য ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে।

ইংলিশবাজার ব্লকের প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম জানান, পোস্ট কার্ড ক্যামপেইন, হ্যান্ডবিল প্রচার, পোস্টারিং করা হয়েছে। সমপথের স্থায়ী গ্রাহক করা হয়েছে ৬ জনকে। ৩৫টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা করা হয়। স্কুলে মায়েদের ডেকে শিশুদের অধিকার নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজ্য সঞ্চালক রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্ত জানান এবং আদর্শ বিদ্যালয় সংক্রান্ত আগামী কর্মশালার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সিদ্ধান্ত হয় কালিয়াচক ৩ নং ব্লক থেকে ইলা মৈত্র জেলার প্রতিনিধি হিসাবে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন। সি. আর. সি সপ্তাহ, শিক্ষা অধিকার দিবস ও মানবাধিকার দিবস পালনের কথা বলা হয়। পাঠচক্র এবং গ্রাম সংসদে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনার কথা বলা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ব্লক পর্যায়ে গ্রামসংসদ-এর সভা নিয়ে প্রচার ও অংশগ্রহণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা ও ২৮ নভেম্বর শিক্ষা অধিকার দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত হয়। জেলাস্তরে ১০ ডিসেম্বর, শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা হবে। জানুয়ারি, ২০১১ অধিকার আইন নিয়ে র‍্যালির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আরও সিদ্ধান্ত হয় রাজ্যস্তরে আগামী ১৯-২১ নভেম্বর শিশু সম্মেলন বিষয়ক যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে জেলার পক্ষ থেকে অখিল মন্ডল ও তাহেরা খাতুন যোগদান করবেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক
জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

গত **৩০শে অক্টোবর** মথুরাপুরে জেলা অফিসে জেলা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচ্যসূচী ছিল - জেলার পরবর্তী পরিকল্পনা ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সিদ্ধান্তসমূহ। রবিশঙ্কর রায়-এর সভাপতিত্বে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন নামখানা, মথুরাপুর ১ ও ২, পাথরপ্রতিমা ও মন্দিরবাজার ব্লকের ৭ জন সদস্য।

প্রাথমিক আলোচনায় জেলার বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানা যায়, এই জেলায় গত ২-৩ মাস ধরে অধিকাংশ সদস্য অনুপস্থিত থাকছেন। কয়েকজন অনিয়মিত ও কয়েকজন দীর্ঘদিন জেলার সভায় অংশগ্রহণ করেননি। ফলে জেলার কর্মসূচীগুলি অসমাপ্ত হয়ে রয়েছে। উপস্থিত রাজ্য সঞ্চালক জানান জেলায় ওয়েবেনের কর্মসূচীগুলি এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, বিশেষত শিশু দলের সভার জন্য গাইডলাইন তৈরির উদ্দেশ্যে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে আগামী নভেম্বরে কলকাতায়। রাজ্য সঞ্চালকের প্রস্তাবে ও উপস্থিত সকলের সমর্থনে জেলার পক্ষ থেকে রবিশঙ্কর রায় মহাশয় এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন সিদ্ধান্ত হয়। কোনো কারণবশত তিনি উপস্থিত থাকতে না পারলে পরিবর্ত হিসাবে কনক সরদার মহাশয় ওই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া নভেম্বরের মধ্যে এবং শিশু ইস্তাহার বিষয়ে জেলার পক্ষ থেকে প্রস্তাবগুলি জানাতে বলা হয়।

জেলার কাজের রিপোর্ট : জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু ছোট কাজ হয়েছে। বিশেষত মথুরাপুর-১ ব্লকের রবিশঙ্কর রায় মহাশয়ের উদ্যোগে বেশ কিছু পঞ্চায়েত স্তরের দল গঠন করা হয়েছে। জেলায় শিশুদলগুলি অধিকাংশই গঠন করা হয়েছে। আলোচনায় জানা যায়, তথ্য জানার অধিকার আইন প্রয়োগ করে ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বেশ কিছু আবেদন করে সাফল্য পাওয়া গেছে। আগামি কর্মসূচী হিসেবে

১) স্বনির্ভরগোষ্ঠীকে শিক্ষা ইস্যুতে যুক্ত করার কর্মসূচি অনুযায়ী গোষ্ঠীর সভায় অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (প্রতি জিপি-তে ১টি করে)। ১৩ নভেম্বরের মধ্যে সভাগুলি করা হবে, বিশেষত মাসের দ্বিতীয় শনিবার দিনটি স্থির করা হয়।

২) বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ ভর্তির জন্য গ্রাম চিহ্নিত করা হবে

৩) নভেম্বরের গ্রামসংসদের সভায় অংশগ্রহণ করা হবে

৪) ব্লকস্তরের শিশুদের সভা করা হবে

ব্লকস্তরে শিশুদের সভার জন্য বাজেট বরাদ্দ কম থাকায় স্থির হয় যে যে ব্লক আর্থিকভাবে সক্ষম এবং বরাদ্দ বাজেটের মধ্যে যারা আয়োজন করতে পারবে তারা আপাতত সভার আয়োজন করবে। রাজ্য কার্য্যকরী কমিটির সভায় জেলার পক্ষ থেকে এবিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব পেশ করা হবে।

পুরুলিয়া জেলা শিক্ষা ফোরাম
জেলা কার্যনির্বাহী সমিতির সভা

গত **৩০শে অক্টোবর** বিধান চন্দ্র মাহাতো মহাশয়ের সভাপতিত্বে জুবিলী ময়দানে জেলার কার্যনির্বাহী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল - জেলা ও ব্লকের কাজের প্রতিবেদন, প্রাক নির্বাচন পর্বে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ ও তার প্রয়োগ নিয়ে প্রচার, রাজ্য Capacity Building ও আদর্শ বিদ্যালয় গঠন বিষয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার জন্য জেলা প্রতিনিধি নির্বাচন, জেলা ই.সি. কমিটির বিষয়ে আলোচনা ও জেলা কর্মসূচী গ্রহণ এবং অন্যান্য।
জেলা কার্যনির্বাহি সমিতির সদস্যরা তাদের নিজ নিজ ব্লকে যেসব কাজ হয়েছে সেগুলির বিবরণ দেন। কাজগুলি হল: শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন ও এস.সি.পি.সি.আর. গঠনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পোষ্ট কার্ড পাঠানো, ব্লক শিশুদল গঠন, সদস্যসংগ্রহ। তাঁরা জানান, স্কুলছুট ও শিশুশ্রমিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষার কাজ চলছে এছাড়াও কয়েকটি ব্লকে RTI-এর মাধ্যমে NREGA ও ICDS এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানানো হয়। জেলার আরো কিছু ব্লকে কাজের বিস্তারের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তাঁরা জানান। উপস্থিত রাজ্য প্রতিনিধি এলাকা বাড়ানোর থেকে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (৬-৭টি ব্লকে) নিবিড়ভাবে সাফল্যের সাথে কাজ করে এলাকা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন। এছাড়া ব্লক ও জেলা স্তরে ২০১০-২০১১ সালের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠচক্র আয়োজন করা, SHG-কে শিক্ষা ইস্যুতে সামিল করা, সদস্য/সদস্যাদের জন্য Information Register তৈরি করা, জেলায় একটি গ্রাম চিহ্নিত করে ১০০ ভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করার জন্য ওকালতি করা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি ও পঞ্চায়েত, শিক্ষক ইউনিয়ন ও S.I.-দের সঙ্গে শিক্ষা অধিকা আইন-এর প্রয়োগের জন্য ওকালতি করারও তিনি পরামর্শ দেন। ১৪ই নভেম্বর শিশু অধিকার দিবসের কর্মসূচী গ্রহণের এবং Capacity Building কর্মশালায় (১১-১৩ নভেম্বর) ও আদর্শ বিদ্যালয় গঠন বিষয়ে কর্মশালায় (১৯-২১ নভেম্বর) অংশ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত জেলা প্রতিনিধি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয়, ১৪ নভেম্বর শিশু অধিকার দিবস পালন উপলক্ষে জেলার ৬টি ব্লকে শিশুদের নিয়ে মিছিল করা হবে। এছাড়া ২৮ নভেম্বর পুরুলিয়ার জুবিলী ময়দানে শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে পাঠচক্র করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়েবেনের রাজ্য অফিস থেকে ইস্তোহার পাওয়ার পর প্রাক নির্বাচী প্রচারের কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত হয়।

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯
খসড়া নিয়মাবলী জমা দিল ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক

গত ১৪ সেপ্টেম্বর ওয়েবেন সহ বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যের এক প্রতিনিধি দল নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে শিক্ষা অধিকার আইন কার্যকর করার জন্য এক খসড়া নিয়মাবলী জমা দেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সচিব উপস্থিত না থাকার কারণে যুগ্ম সচিব টি. কে. অধিকারির কাছে এই খসড়া নিয়মাবলী জমা দেওয়া হয়। যুগ্ম সচিব মহাশয় এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একটি খসড়া নিয়মাবলী তৈরি করেছে, তা আগামী কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত হবে। তিনি রাজ্য সরকারের তৈরি করা খসড়া নিয়মাবলীর উপরে মতামত আহ্বায়ন করেন। ওয়েবেনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, রাজ্য সরকারের খসড়া নিয়মাবলী রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটে দেবার জন্য যাতে তা চূড়ান্ত করার আগে জনসাধারণ মতামত দিতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করার জন্যও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে দাবি করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যুগ্ম সচিবের থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে পাওয়া রাজ্য সরকারের খসড়া নিয়মাবলীর ওপরে ওয়েবেন সহ অন্যান্য সংগঠনের মতামত শিক্ষা সচিবের কাছে পুনরায় জমা দেওয়া হয় গত ৩০ শে সেপ্টেম্বর তারিখে। ওই খসড়া নিয়মাবলীর একটি প্রতিলিপি যুগ্ম সচিবের কাছেও দেওয়া হয়। তিনি এই মতামতগুলি খসড়া কমিটির কাছে পেশ করবেন ও শিক্ষা দপ্তর সেগুলি যথাযথ বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

গণতন্ত্র ও শিক্ষক

■ অতনু সাঁই ■

''আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতের সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক.....নিজেদের অর্পণ করছি''।

প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের প্রথমেই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বড় হরফে ছাপা হয়েছে। কিন্তু যাদের জন্য এই আয়োজন সেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মূল্যবোধগুলি সঠিকভাবে তৈরি করা যাচ্ছে কি? আজকের বিদ্যালয় ব্যবস্থা সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলিকে লালনে কতটা সক্ষম? এই ধরনের প্রশ্ন গুলি নিয়ে আজকের দিনে গভীরভাবে ভাবনা চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। গণতন্ত্রের কথাই ধরা যাক, 'গণতান্ত্রিকতা' অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মূল্যবোধ। তাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে লালন করার জন্য বিদ্যালয় হতে পারে এক আদর্শ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আমাদের দেশের চালু বিদ্যালয়গুলির শ্রেণিকক্ষে 'গণতন্ত্রের' সুলুক সন্ধান, যেন রাশি রাশি জঞ্জালের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট সূঁচ খুঁজে বের করার মতোই। আমরা মূলত ইংরেজ প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাকেই বহন করে চলেছি। ইংরেজ প্রবর্তিত এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল এমন একদল ভারতীয় তৈরি করা যারা ইংরেজের শাসন ও শোষণ কার্যে সাহায্য করবে। এরা জন্মে ভারতীয় হলেও সংস্কৃতি ও মানসিকতায় ইংরেজ হবে। এর জন্য স্কুলের সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা যাবে না, চুপচাপ মুখ বুজে কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করতে হবে, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ থাকবে না, যান্ত্রিকভাবে একই ধরনের কাজ বারবার করতে হবে এবং শিখন প্রক্রিয়ায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছাত্র-ছাত্রীদের থাকবে না। আয়োজনের সবটুকু স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রপ্ত হতে হতে সারা জীবনের জন্য নিজেকে গোলাম তৈরি করে ফেলার ব্যবস্থা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধে এই ধরনের স্কুল সম্বন্ধে বলেছেন -

''ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সড়ে দশটার সময় ঘন্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে''। কবিগুরুর এই কথা থেকে এটা পরিষ্কার যে এই ধরনের স্কুলে আর যাই হোক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি হতে পারে না। কারণ গোটা ব্যবস্থাটা তৈরিই হয়েছিল কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন হয়েছে তার বেশিরভাগটাই মূল ব্যবস্থাকে অবিকৃত রেখে কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন মাত্র। ইংরেজ প্রবর্তিত মূল ব্যবস্থাকে কখনো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। বলা ভালো দেশের মানুষের কথা ভেবে একটা দেশজ শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করার সদিচ্ছা আমাদের রাষ্ট্রনায়করা দেখাননি। তার কারণ ইংরেজের চালু করা শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চশ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ছিল। সুতরাং স্বাধীনতার পরে শাসক বদলালেও সামাজিক ক্ষমতার স্তর বিন্যাসে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দেশের চালিকাশক্তি এর পরিবর্তন চেয়েছেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যায়নি। ফলে ঔপনিবেশিক 'ফ্যাক্টরি মডেল' বিদ্যালয়ের স্বৈরতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষের চরিত্র আজও বদলায়নি। আর এই ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষে বেড়ে ওঠা ছাত্র-ছাত্রীরা ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক নাগরিক হয়ে ভারতের বৃহত্তম গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে এই আশা করা শুধু অমূলক নয়, বাতুলতার নামান্তর।

একজন শিক্ষক স্বৈরতান্ত্রিক না গণতান্ত্রিক তা নির্ধারণের জন্য শ্রেণিকক্ষের ভৌত ও সামাজিক পরিবেশ, ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্ক, পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, শ্রেণিকক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী সকলের ভাষা ও তার প্রয়োগ, মতামতের প্রকাশের স্বাধীনতা এবং কর্মসংস্কৃতির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিকক্ষে উপরোক্ত বিষয়গুলিকে একজন শিক্ষক কেমনভাবে দেখবেন এবং বিষয়গুলিতে তাঁর আচরণ ও ভূমিকা কেমন হবে তার উপর নির্ভর করছে স্বৈরতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক ব্যক্তি হিসাবে তাঁর প্রকাশ। অর্থাৎ একথা বোধহয় বলা যায় শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের বাইরে একজন শিক্ষকের ''স্বৈরতান্ত্রিক' বা 'গণতান্ত্রিক' কোনো সত্তারই অস্তিত্ব নেই। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করেই শিক্ষকের স্বৈরতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক সত্তার হদিস পাওয়া যেতে পারে।

'শ্রেকিক্ষ সমাজের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ' জন ডিউই ও অন্যান্য অনেক শিক্ষাবিদ্‌দের এই মতকে যদি মেনে নিই তবে এটা বলা যায় সমাজের ভালো-মন্দ সমস্ত বিষয়গুলিও শ্রেণিকক্ষে থাকে বা থাকতে পারে। শ্রেণিকক্ষে ক্ষমতা আছে তার টানাপোড়েন আছে, ক্ষমতার একটি বা অনেক কেন্দ্র থাকতে পারে, ক্ষমতার বন্টন অনুসারে নির্ধারিত সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কের প্রকাশ আছে। এইভাবেই একটা পরিবেশ গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। ইংরাজিতে 'democracy' শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'demokratia' (rule of the people) থেকে। 'Demokratia' কথাটি তৈরি হয়েছে দুটি গ্রীক শব্দ থেকে 'demos' (জনগণ), 'kratos' (ক্ষমতা)। শব্দটির উৎপত্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে মানুষ ও ক্ষমতা এই দুটি গণতন্ত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

গণতন্ত্র বলতে যদি ক্ষমতার সুষম বন্টন (equal distribution of power) বলে মেনে নিই তাহলে প্রশ্ন হবে শ্রেণিকক্ষের প্রেক্ষাপটে এই বন্টনের স্বরূপ কেমন হবে। শ্রেণিকক্ষকে একটি সামাজিক পরিবেশ-একক মেনে নিলে বলা যায় এখানে মোট ক্ষমতার পরিমাণ ধ্রুবক। তাহলে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কারো ক্ষমতায়ন হলে, কেউ সেখানে ক্ষমতা হারাবে। শ্রেণিকক্ষে ক্ষমতার যে বিন্যাস বা গঠনতন্ত্র তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটাতে পারলে তবেই গণতান্ত্রিক পরিবেশের কথা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয়ও মাথায় রাখতে হবে শ্রেণিকক্ষ যেহেতু সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ তাই সমাজের শ্রেণি-অবস্থান ক্ষমতার টানাপোড়েন ও বৃহত্তর সমাজের আন্তঃশ্রেণি সম্পর্ক শ্রেণিকক্ষে দারুণভাবে প্রতিফলিত হয়। বেশিরভাগ সময় এগুলির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষে সম্পর্কের স্বরূপ তৈরি হয়। একজন শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বৃহত্তর সমাজে তাঁর নিজস্ব শ্রেণি-চরিত্রকে অতিক্রম করে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শ্রেণি-বৈষম্য (যদি থাকে) দূর করা।

অনেকে গণতন্ত্রকে সমান সুযোগের সমার্থক বলে মনে করেন। এঁরা সকলের জন্য সমান সুযোগকেই গণতন্ত্রের স্বরূপ বলে মনে করেন। রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে আইনত এই 'সমান সুযোগ' দিলেও সেখানে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নাও হতে পারে। একট উদাহরণ নেওয়া যাক, মনে করা যাক একটি জঙ্গলে একদিন সিংহ রাজা ঘোষণা করলেন আজ থেকে জঙ্গলে সবার খাদ্য-অন্বেষণে সমান সুযোগ থাকবে এবং এক্ষেত্রে কেউ কারোকে বাধা দিতে পারবে না। এই ঘোষণার পরেও কি বাঘ আর হরিণ সমান সুযোগ পাবে? হরিণ খাদ্য সংগ্রহের আগেই খাদ্য হিসাবে বাঘের পেটে চলে যাবে। অর্থাৎ আমার মতে ক্ষমতার বৈষম্য থাকলে সুযোগ সম্পূর্ণরূপে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বলা যেতে পারে ক্ষমতার সুষম বন্টন গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত, সমান সুযোগ তার ফল। শ্রেণিকক্ষে যখন সমান সুযোগরে কথা বলি সেখানেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। শ্রেণিকক্ষের ক্ষমতার গঠনতন্ত্রকে (Power structure) চ্যালেঞ্জ করাটাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক শর্ত।

গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ও শিখন প্রক্রিয়া:

আমরা সামাজিক জীবনে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত কেমন ভাবে নিই? একটা উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক। মনে করা যাক গ্রামে একটি নতুন বিদ্যালয়গৃহ তৈরি করা হবে। গ্রামের বিভিন্ন মানুষের এই বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ নিয়ে নানান মাতমত আছে এবং মতের পার্থক্যও আছে। গ্রামের মানুষের মধ্যে বিদ্যালয়গৃহের অবস্থান, ব্যবহার্য উপাদান ক্রয় ও উপাদান সংগ্রহ সংক্রান্ত নানান বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা, যুক্তির আদান প্রদান এসব চলার পর একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার রীতি থাকলেও সংখ্যালঘুদের মতামতকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে নথিভুক্ত করে রাখাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রয়োজনে সংখ্যালঘুদের মতামতের উপর পুনরায় আলোচনা হতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন সমাজে এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার রীতিই আমাদের অভিপ্রেত হলেও, বিদ্যালয়ে এই প্রক্রিয়া খুবই কম দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনো একটি বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে, তর্ক-বিতর্ক করছে, বিচার-বিশ্লেষণ করছে, নিজেদের বোধ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস এসব তুলে ধরে মতামতের বিনিময় করছে এবং শেষে যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে এরকম ঘটতে দেখা শ্রেণিকক্ষে একটি বিরলতম ঘটনা। বরং 'শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিখিয়ে দেবেন, শিক্ষকের কথা শোনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা নিছক সময় নষ্ট ছাড়া কিছু নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে বেশি কথা বললে শ্রেণিকক্ষে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা মুশকিল' এরকম বিশ্বাস অনেক বেশি করে দেখা যায়। তাই শ্রেণিকক্ষে শিশুদের ছোট দলে, বড় দলে কাজ করানোর কথা বলা হলেও অনেক সময় দেখা যায় শিশুরা দলে বসছে ঠিকই, কিন্তু দলে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে না, এখানেও শিক্ষকই শেখাচ্ছেন। কেবল বসার ধরণটা বদলেছে মাত্র। অর্থাৎ দলে বসাটা এখানে আলংকারিক হয়ে গেল, দলে বসার উদ্দেশ্য সাধিত হলো না। এইরকমভাবে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ বাহ্যিকরূপে গণতান্ত্রিক মনে হলেও অনেক সময় তা নাও হতে পারে। একটি শিশু কোনো বিষয়ে তা বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ধারণা, চিন্তা, সংস্কার, সংশয় এসব অন্যান্য সমবয়সীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে ফেলবে এবং অন্যদের সঙ্গে তুলনা, বিচার, বিশ্লেষণ ইত্যাদির দ্বারা নিজের মতো করে জ্ঞান গঠন করবে। জ্ঞান গঠনের এই প্রক্রিয়ায় যে শিক্ষক বিশ্বাস করেন তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার সুযোগ করে দেবেন ফলে তিনি কখনো শিশুদের ছোট দলে, কখনো বড় দলে কাজ করার সুযোগ দেবেন। এইভাবে একটি কমরীতির পিছনে শিক্ষা-দর্শন বা উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করা গেলে তবেই তা সফল হতে পারে। এখানে শিক্ষকের তাঁর নিজের ভূমিকা সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকে, তিনি নিজেকে এখানে সমগ্র প্রক্রিয়ায় 'সহায়ক' (facilitator) হিসাবে দেখেন। জ্ঞান গঠন প্রক্রিয়ায় তিঁনি নিজের মতামতকে একজন পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের মতামত (adult perspective) হিসাবে রাখতে চান। তাঁর মাতামতই সঠিক এমনকি তিনি মনে করেন না। অপর পক্ষে এর সম্পূর্ণ বিপরীত বিশ্বাসের শিক্ষক মনে করেন ছাত্র-ছাত্রীরা তাই শিখবে, যা তিনি শেখাবেন। তিনি বিশ্বাস করেন তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের ভাণ্ডার হতে 'সঠিক জ্ঞানের' বিতরণ করে শিশুদের সমৃদ্ধ করবেন। এই বিশ্বাস থেকেই তাঁর কাছে শিশুদের দলে বসা কিংবা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা 'অপ্রয়োজনীয়' কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। তাই একথা বোধহয় বলা যায় যে একজন শিক্ষকের অর্জিত নিজ বিশ্বাস (own belief system) তাঁকে গণতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক শিক্ষক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে প্রভাবিত করে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও শিক্ষকের ভূমিকা :

গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিশুকে শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণে শিক্ষক উৎসাহ দেন। শিশুদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করেন। প্রতিটি শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে শোনেন। প্রতিটি শিশুর অভিজ্ঞতা শিক্ষক মূল্যবান মনে করেন এবং তা শিখন প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসার জন্য শিশুদের সুযোগ দেন। শিশুদের আবেগ, অনুভূতি শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষক তা প্রকাশে পূর্ণ-মাত্রায় সুযোগ দেন। এখানে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের দিশা-নির্দেশ দেন। পাঠক্রমের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিশুদের সঠিক দিশা নির্দেশ করা শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে সামনে রেখে তিনি সমগ্র শিখন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন এবং শিখন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য শিশুদের সঙ্গে মিলে তৈরি করেন। প্রতিটি শিশুর কাছে এই লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে জানিয়েও রাখেন। শিখন পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করেন। শিশুরা এখানে ভুল করার ভয়ে কাজ করতে পিছপা হয় না। শিক্ষক ভুল উত্তর বলে কোনো কিছুকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন না বরং এই ধরনের উত্তরকে শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসাবে দেখেন। এখানে শিশু ও শিক্ষকের পারস্পরিক শ্রদ্ধাই সম্পর্কের মূল ভিত্তি। শিক্ষক নিজেকে এখানে জ্ঞান গঠনের সহ-কারিগর (co-constructor of knowledge) ভাবেন।

স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষক শিখন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের জানানোর প্রয়োজন অনুভব করেন না। তিনি শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং নিজের ইচ্ছামত চালনা করতে পছন্দ করেন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষন প্রক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় (Passive) থাকে। শিক্ষক তার পছন্দ মতো পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত জানানোর বা প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে না। এখানে সবসময় সঠিক উত্তর চিহ্নিত করে কেবলমাত্র সেগুলিকেই গ্রহণ করা হয়,

ফলে শিশুদের মধ্যে ভুল করার ভয় চেপে বসে। শিশুদের শিক্ষক নিচু দৃষ্টিতে দেখেন এবং নতুন ধারনা বা শিশুদের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করার মতো নমনীয়তা দেখান না।

শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা:

শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বলতে যা বোঝায় তা হলো ঐ বিশেষ জায়গার কিছু সাধারণ নিয়ম থাকবে এবং সকলে তা পালন করবে। অবশ্যই এই 'সকলে'র মধ্যে শিক্ষকও থাকবেন। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শ্রেণিকক্ষের এই নিয়ম কে বা কারা বানাবে? শুধুই কি শিক্ষক এই নিয়ম বানাবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তা মেনে চলবে? নাকি ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক সকলে মিলে এই নিয়মবিধি তৈরি করবেন এবং সকলে তা মেনে চলবে? অবশ্যই সকলে মিলে নিয়ম তৈরি যেমন করবে, সেই নিয়ম মানবেও সকলে। এটাই গণতান্ত্রিক শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রথম শর্ত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষকের চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখে। অপরপক্ষে স্বৈরাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষক মনে করেন শিশুদের কঠোর নিয়ম নীতির মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখানে তিনি শিশুদের জন্য নিয়ম তৈরি করেন এবং শিশুদের এই নিয়ম যেকোনো মূল্যে মেনে চলতে হয়। এক্ষেত্রে কোনোভাবে আইনভঙ্গ হলে কঠিন শাস্তি নেমে আসে। শাস্তি দিয়ে কর্তৃপক্ষ সকলকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। নিয়ম ভাঙার অর্থ এখানে কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করা। আর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাকে কোনভাবে চ্যালেঞ্জ করা মানেই অবশ্যম্ভাবী শাস্তি নেমে আসবে। এই নিয়ম তৈরি করতে বা পরিবর্তন করতে কখনোই ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে না। এই নিয়ম শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা যা শিশুকে সবসময় ভয়ের মধ্যে রাখে, শিশুর আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে দেয় না, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয় না এবং অনেক সময়েই শিশুর মধ্যে নিয়ম ভাঙার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষকের ভাষা ও শ্রেণিকক্ষে ভাবের আদান প্রদান:

ভাষা সংস্কৃতির প্রকাশের মাধ্যম। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের শব্দচয়ন, কথা বলার ধরন বা প্রকাশভঙ্গি ও শারীরিক ভাষা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারা যায়। অনেক সময়েই শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত ভাষা একটা বড় অংশের শিশুদের শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণে বিরত করে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের মাতৃভাষা এক হলেও প্রায়ই দেখা যায় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যে ভাষা ব্যবহার করছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ছাত্র-ছাত্রীদের কথ্য ভাষা থেকে এই ভাষা অনেকটাই আলাদা। কখনো কখনো শিশুর বাড়ির ভাষা ও শ্রেণিকক্ষে নির্দেশিত ভাষা (Medium of Instruction) ভিন্ন হয়, ফলে শিশু নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে। গণতান্ত্রিক শিক্ষক ভাষার এইসব বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে শ্রেণিকক্ষে ভাষার ব্যবহার করেন। তিনি নজর রাখেন কোনো শিশু যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, সকলের অন্তর্ভুক্তিই তার প্রধান এবং প্রাথমিক লক্ষ্য। এই শিক্ষক শিশুদের ভাষাকে খোলা মনে গ্রহণ করেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন শিশুর ভাষাকে বর্জন করার অর্থ তার সংস্কৃতিকে বর্জন করা, প্রতিটি শব্দের পিছনে থাকা বৃহৎ জ্ঞান ভাণ্ডারকে অস্বীকার করা। এখানে শিক্ষক বাড়ির ভাষার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভাষা, আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে মান্য ভাষার সেতু রচনা করে শিশুদের সাহায্য করেন এবং সকলের অংশগ্রহণ সু-নিশ্চিত করেন। অপরপক্ষে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক শিক্ষক এইসমস্ত বিষয়গুলির পরোয়া করেন না। তাঁর শব্দচয়ন, প্রকাশভঙ্গি, শারীরিক ভাষা এসব বুঝিয়ে দেয় যে শ্রেণীকক্ষের মূল নিয়ন্ত্রক তিনিই। তিনি তাঁর পছন্দ মতো ভাষার প্রয়োগ করেন, শিশুদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাঁর মাথাব্যাথা থাকে না। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষক বরং ভাষাকে তাঁর ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে দেখেন।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা:

যে কোন শিখন প্রক্রিয়ার মূল্যায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক ফলাফল যেমন জানা যায় তেমনি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই সমগ্র ব্যবস্থার স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেয়। স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল্যায়ন, যা কেবলমাত্র পরীক্ষার মধ্যে সীমিত থাকে শিক্ষকের কাছে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। স্বৈরতান্ত্রিক শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মূল্যায়নকে সুচতুরভাবে প্রয়োগ করেন। তাঁর কাছে মূল্যায়ন বলতে শুধুই ক্ষমতার প্রদর্শন। এই শিক্ষকের মূল্যায়ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি অতি সংকীর্ণ (Narrow) তিনি মল্যায়ন বলতে কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা 'কতটা জানে' তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং তারা 'কতটা জানে না' তা প্রমাণ করতেই তিনি ব্যস্ত। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন - শিখন প্রক্রিয়া, পাঠ্যপুস্তক সহ সমস্ত শিখন সামগ্রী, পাঠক্রম ইত্যাদির মূল্যায়নের কথা ভাবেনই না। তিনি একই মাপকাঠিতে সবাইকে মাপেন, সেখানে কেউ পিছিয়ে পড়লে বা কেউ দ্রুত এগিয়ে গেলে আলাদা ব্যবস্থা নেওয়ার মানসিকতা বা উপায় কোনোটাই থাকে না। অপরপক্ষে গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমগ্র ব্যবস্থার মূল্যায়ন করে ব্যবস্থার শক্তি, দুর্বলতাগুলিকে চিহ্নিত করেন ও তা দূর করার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি শিশুর শিখন দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে তা নিরাময়ের পন্থা বের করা। তিনি বিষয়টি এভাবে দেখেন যে ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে একটা যাত্রা শুরু করেছে কেউ একটু দ্রুত এগোচ্ছে, কারও একটু বেশি সময় লাগছে, কেউবা সঠিক গতিতে এগোচ্ছে যা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। মূল্যায়ন এই শিক্ষকের কাছে সেই যন্ত্র যা তাঁকে শিশুদের এইসমস্ত গতিপ্রকৃতির বিচার, বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে এবং প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করে। এখানে শিশু কতটা জানে তার বিচার করে তাকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলাই মূল উদ্দেশ্য।

পরিশেষে একথা বলা যায় আমাদের সংবিধানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও তা বোধহয় সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। ভারত এক বিশাল দেশ যেখানে নানা জাতি, নানা ধর্মের, নানা ভাষাভাষির মানুষ বাস করেন। ভারতীয় সমাজে নানান ভাবে, নানা রূপে হাজার রকমের বৈষম্য বিদ্যমান। এই রকম বৈচিত্রপূর্ণ দেশে প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লালন করা ও প্রতিষ্ঠা করা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা যদি আমরা আন্তরিকভাবে করতে চাই তাহলে শুধু পাঠ্যপুস্তকের প্রথম পাতায় সংবিধানের প্রস্তাবনাকে ছাপলেই দায়িত্ব শেষ হবে না, এখানে উল্লেখিত মূল্যবোধগুলিকে শ্রেণিকক্ষে রোজকার অভ্যাসের বিষয় করে ফেলতে হবে। এভাবে বেড়ে ওঠা শিশুদের হাত ধরেই এগুলি বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করবে। এর জন্য প্রয়োজন আজকের বিদ্যালয় ব্যবস্থার সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন। আগামী কয়েক দশক হয়তো আমাদের দেশে 'গণতান্ত্রিকতা' ও 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা' এই দুটি মূল্যবোধকে বিদ্যালয়স্তরে বেশি বেশি করে লালন ও অভ্যাস করাতে হবে। শৈশব থেকে প্রশ্ন করা, বিচার বিশ্লেষণ করা, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা, নিজে নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারা, সমস্যার সমাধান করতে পারা এবং দলে কাজ করার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এইভাবে বেড়ে ওঠা শিশুরাই ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু আজকের শিশুরা যদি এই সুযোগ না পায় তাহলে 'গণতন্ত্র', 'গণতান্ত্রিকতা' এসব শুধু কথার কথা হয়ে থাকবে, প্রকৃত স্বরূপ জানা হবে না।

মূল্যবান এই প্রবন্ধটির উপরে মতামত পাঠতে পাঠকদের আহ্বান জানানো হচ্ছে। - **সম্পাদক**

A consultation of various organizations on the Draft Rule to implement the RTE Act 2009 in West Bengal was organised by West Bengal Education Network (WBEN) on last 4th September in Kolkata. It was a follow up meet of a Consultation previously organised by WBEN on the implementation of the RTE Act on May 5, 2010, where it was decided to prepare a draft State rule for submission to the Government of West Bengal. Following are the points added with the Central model rule for the State of West Bengal finalized in the above said consultation.

Definitions

2(f) "disadvantageous group" mean, apart from what provided under Section 2(d) of the Act, to include all children who owing to their social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or physical condition are unable to pursue and/or complete their primary education.

(g) "Free" includes text books, learning materials, uniform, and conveyances and other allowances as according to need of a child and requirement of a school so as to ensure that no child is constrained to discontinue education till he/she completes his/her primary education due to lack of resources.

PART II – RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION

Penalty for the purpose of Section 3(1)

3. Whoever found guilty of taking any charges and/or expenses in contravention to the provisions of Section 3(1), shall be liable to a fine which will be equivalent to ten times of the charges and/or expenses so taken or Rs. 1,00,000/- whichever is less.

PART III – DUTIES OF STATE GOVERNMENT, LOCAL AUTHORITY

Areas or limits for the purposes of section 6

4(7) In order to cover all the habitations, including tribal, across the State, the local authorities will undertake a micro-level survey with regard to predominantly SC/ST and minority habitations and furnish specific requirements of additional schools. (8) Residents of an area not having a school within 2 Kms with child population more than 30 can demand for establishment of a neighbourhood school before the local authority and it will be the duty of the local authority to forthwith forward such demand before the State Government and after being satisfied with the child population of the said area the State Government shall immediately establish a neighbourhood-school-on-demand.

5. The local authorities shall proactively disclose and make known to the general public the number and location of schools established under the Act within its jurisdiction which shall also include details of the infrastructural facilities being provided in each of such schools.

6. It will be the duty of the School Management to proactively disclose information with regard to the teacher-student ratio, the details of the infrastructure and also details of mid day meal scheme being provided in the school.

Provided that the guardians shall have the right to inspect the school premises including quality of mid day meal with the permission of the Head Master who will consider such prayer and will allot a convenient time for such inspection.

7. For the purpose of sharing details of the resource, both financial and non-financial, with the people, through a public platform, the local authorities shall conduct quarterly Social Audits of the schools and submit its report to the State Government.

Provided it will be mandatory for the local authorities to include non governmental organizations, civil societies and representatives of the guardians in the process of Social Audits.

Duties of State Government and Local Authority for the purposes of Sections 8 and 9

8. Explanation: (5)) A child attending a school of the State Government or local authority referred to in sub-clause (i) of clause (n) of section 2, a child attending a school referred to in sub-clause (ii) of clause (n) of section 2 in pursuance of clause (b) of sub section (1) of section 12, and a child attending a school referred to in sub-clause (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 in pursuance of clause (c) of sub section (1) of section 12 shall be entitled to a Health Card which will entitle that child to free medical treatment including free medicines at all government hospitals.

Provided that in all school it will be mandatory to maintain a medical kit which will include first aid and essential medicines for emergency purposes.

Pre-school education for the purpose of Section 11

10.(1) For the purpose of providing early childhood care and education to all children between the age group of 3 to 6, an Early Childhood Care and Education Centre will be established at every neighbourhood school

and the same will be linked with the local ICDS or Anganwari Centres and until and unless such Early Childhood Care and Education Centres are in progress, the ICDS Centres will work as an Early Childhood Care and Education Centre.

(2) A full time teacher, preferably a female, with knowledge and training in early childhood care and education will be recruited and appointed for each Early Childhood Care and Education Centre (3) It will be the duty of the teacher to link with the ICDS Centres and make a list of children between 3 to 6 years within its jurisdiction and encourage the parents to enroll their children in the Centres.

PART V - SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE

Composition and functions of the School Management Committee for the purposes of section 21

17(2) The School Management Committee will comprise the following:

(a) not less than 60 percent of the members of the School Management Committee in all School including unaided school will be from among the guardians.
(b) not less than 10 percent of the members will be from among the elected members of the local authority
(c) 5 percent members will be teachers of the school
(d) 10 percent members will be students between the age group of 13 to 18 years
(e) 15 percent members will be from amongst the members of local libraries, NGO, Educationist and community people other than Guardians

PART VI – TEACHERS

19 No teacher shall be deputed or designated or nominated to do any other task other than for the purpose of teaching as provided under the Act or for the purpose of the Rules.

20 All teachers recruited for the purpose of the Act will be full time teachers and under no circumstances para-teachers or part time teachers be engaged in any school.

Acquiring minimum qualifications under proviso to section 23(2)

23 (1) The State Government shall provide adequate teacher education facilities that will include special trainings in child psychology to ensure that all teachers in schools referred to in sub-clauses (i) and (iii) of clause (n) of section 2, who do not possess the minimum qualifications laid down under sub-Rule (2) of Rule 15 at the time of commencement of the Act, to acquire such minimum qualifications within a period of five years from the commencement of the Act.

Duties to be performed by teachers for the purpose of clause (f) to section 24(1)

25 (1) (c) Have regular meetings with students in order to remove any difficulties that the students might be facing;
(d) Have regular meetings with the guardians;
(e) Conduct Home visit whenever necessary or if decided necessary by the School Management Committee

PART VII – CURRICULUM AND COMPLETION OF ELEMENTARY EDUCATION

Academic Authority for the purposes of section 29

28 (2)(b) formulate and include in the syllabus area specific information and knowledge about history, culture and geography;
(c) formulate and include in the syllabus joyful teaching and learning methodologies;

During the presentation Mr. Suryangshu Bhattacharya said that Anganwadi is not equivalent to pre school education.

নিঃশব্দ সন্ত্রাসের কবলে পাঞ্জাব এখন ক্যানসার বেল্ট

যেন এক স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষ। দেশের খাদ্যভান্ডারেই ছায়া মারণ ব্যাধির।
কেন এই বিপর্যয়? গলদ কি তবে বিপ্লবের পরিকল্পনাতেই?
দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের প্রস্তুতির কালে প্রশ্ন তুললেন **অভী দত্ত মজুমদার**

আয়লা কিংবা সুনামি নয়। বিধ্বংসী বন্যা নয়। ভোপালের মত হঠাৎ পাইপ ফেটে বেরিয়ে আসা অনর্গল মিথাইল আইসোসায়ানেটের বাষ্পও নয়। হ্যারিকেন টাইফুন ক্যাটরিনা কোনওটাই নয়। সপ্তসিন্ধুর দেশ পাঞ্জাব এখন নিত্য রাসায়নিক দূষণের কবলে। কৃষিক্ষেত্র থেকে যা ছড়িয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ক্রমে ক্রমে। নিঃশব্দে।

যে পাঞ্জাবকে বলা হত 'ব্রেড বাস্কেট অফ ইন্ডিয়া' বা ভারতের খাদ্য ভান্ডার, সেই রাজ্যে ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে বাস্তুতন্ত্রের গভীর সংকট। ব্রাজিলের ক্যুবাটাও কিংবা জাপানের বিনামাটা-র মতো আরও একটা মৃত্যু উপত্যকা চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য পআয় প্রস্তুত। রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় মাটিতে বিষ। জলাধারে বিষ। খাবারে বিষ। ঘাতক রাসায়নিক যৌগ সেখানে ঘর বেঁধেছে মানুষের শরীরে, রক্তে, কোষে, মাতৃগর্ভে। রাজ্য জুড়ে কীটনাশক, অতিরিক্ত নাইট্রেট, আর্সেনিক গভীর ক্ষতের মতো জ্বলজ্বল করছে। শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, ফুসফুসের ব্যাধি, বিভিন্ন চর্মরোগে আক্রান্ত আবালবৃদ্ধবনিতা। যে জল ছুঁলে ঘা হয়, মানুষ তা নিয়মিত পান করছে। ঘরে ঘরে মারণব্যাধি - গরিব কৃষকের সংসারে ঢুকছে অকাল মৃত্যুর হানাদার কর্কট রোগ। ভাতিন্ডা অঞ্চলে কোনও কোনও গ্রামে ক্যানসারতো প্রায় প্রতি ঘরে। পরিবারের সাবাই আক্রান্ত, দশ জন। এমনও উদাহরণ আছে। তাই বুক ভরা সেই প্রতিশ্রুতির ব্রেড বাস্কেটের নতুন শিরোপা - ভারতের ক্যানসার বেল্ট। চালু হয়েছে ক্যানসার এক্সপ্রেস। ভাতিন্ডা থেকে বিকানির। ট্রেন নম্বর ৩৩৯। গন্তব্য আচার্য্য তুলসি রিজিওনাল ক্যানসার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, রাজস্থান। স্থানীয় চিকিৎসার সুযোগ নেই, তাই ভরসা ৩৩৯। প্রতি রাতে যেন একটা হাসাপাতালের জরুরি বিভাগ চলেছে মুলুক ছেড়ে শহরে। যদিও সেই উদ্বাস্তু শিবিরে সবার ঠাঁই হচ্ছে, তা নয়। ঘটি বাটি বিক্রি করে যাঁরা পারছেন, তাঁরা যাচ্ছেন। বাকিদের শুধুই আঙুলের কর গোনা।

সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত মালওয়া অঞ্চল - যাকে সবাই চেনে 'কটন বেল্ট' নামে। বড় বড় কোম্পানি সেখানে চুক্তিতে চাষ করাচ্ছে। রপ্তানির তুলো চাষ। যে চাষে অনেক বেশি কীটনাশক লাগে। রাজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ কীটনাশক ব্যবহৃত হয় এই অঞ্চলে। যেখানে জাতীয় গড় ৯০ কেজি, সেখানে কালওয়া অঞ্চলে হেক্টর পিছু প্রযুক্ত হয় ১৭৭ কেজি কীটনাশক। রাসায়নিক সার? তাতেও প্রথম পাঞ্জাব। সবুজ বিপ্লব যত এগিয়েছে, কৃত্রিম রাসায়নিক সার ব্যবহার তত বেড়েছে। ফলন ধরে রাখতে গেলে তা অপরিহার্য। এমনকী বাজেট পেশ করতে গিয়ে গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীও অতিরিক্ত সারের ব্যবহার এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ভারতে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ নিরিখে পাঞ্জাব প্রথম। এটা জানাই ছিল। কিন্তু স্থানীয় জনস্বাস্থ্যে তার প্রভাব পড়েছে। কতটা? সরকার তা কোনও দিনই জানতে চায়নি। ২০০৪ সাল ভাতিন্ডা ও রোপার জেলার চারটে গ্রাম থেকে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতে শুরু করে দিল্লির সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই)। এঁরাই খোদ রাজধানীতে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, কুড়িটি নমুনাতে ৬ থেকে ১৩ রকম কীটনাশক শনাক্ত হয়েছে। অরগানোক্লোরিন গোষ্ঠীভুক্ত কিছু কিছু যৌগের পরিমাণ তো উদ্বেগজনক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস সেন্টার ফর কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনসন-এর ২০০৩ সালের এক সমীক্ষার সঙ্গে তুলনা করে সিএসই জানায় এই দেশে রক্তে প্রাপ্ত ওসি গোষ্ঠীভুক্ত কীটনাশকের পরিমাণ আমেরিকায় প্রাপ্ত পরিমাণের চাইতে ১৫ থেকে ৬০৫ গুণ বেশি। যেমন নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত লিনডেনের পরিমাণই ছিল ৬০০ গুণ বেশি। প্রাপ্ত ডিডিটি-র পরিমাণ ছিল ১৮৮ গুণ বেশি, যে ডিডিটি বিদেশে বহুকাল আগেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে।

সিএসই-র এই পরীক্ষাতেই ভারতে প্রথম মাপা হল অর্গানোফসফেট গ্রুপের কীটনাশকের পরিমাপ। রক্তে এটাও চূড়ান্ত মাত্রায় হাজির। কিন্তু শিল্প মহলের মত - ফসফেট গোষ্ঠীভুক্ত রাসায়নিক কীটনাশক অরগানোক্লোরিনের মতো 'পারসিসটেন্ট' নয়। অর্থাৎ এরা দীর্ঘস্থায়ী নয়, অতএব বিপদ কম। অথচ সংগৃহীত রক্তের ৮০ শতাংশ নমুনায় শনাক্ত হল ক্লোরোপাইরিফস এবং ৭৫ শতাংশ মোনক্রোটোফস। মিলল ফসফ্যামিডন এবং ম্যালথিয়ন। সিএসই এর বিশেষজ্ঞরা প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানালেন, এই ধরনের রাসায়নিক ডিএনএ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। মস্তিষ্ক কোষ উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শিশুদের উপযুক্ত মানসিক বিকাশ রোধ করে। এই ধরনের কীটনাশকের ছোঁয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাতৃগর্ভের ভ্রূণ। কিন্তু পাঞ্জাবের ঘরে বাইরে হেঁসেলে ছড়িয়ে আছে এই বিষ। কে তা নিয়ন্ত্রণ করবে এ দেশে?

> ষাটের দশকে নিজেদের স্বার্থে ভারতে সবুজ বিপ্লব রফতানি করেছিল আমেরিকার ফোর্ড ফাইন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, কৃষি দফতর এবং ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইডি)। তখনই কথা হয় দেশের খাদ্য ভান্ডার হিসাবে গড়ে তোলা হবে পাঞ্জাবকে। আর সেদিনই নিঃশব্দে জারি হয়ে গিয়েছিল কয়েক হাজার পরিবারের মৃত্যু পরোয়ানা।

এই সমস্ত পরীক্ষালবদ্ধ ফলাফল এবং তার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে ডাউন টু আর্থ পত্রিকা (১৫ জুন ২০০৫)। খানিক নড়ে চড়ে বসে পাঞ্জাব সরকার। সে বছরেই বিষয়টা খতিয়ে দেখার জন্য দু-দুটি কমিটি তৈরি হয়। একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি, যার মাথায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। বিশেষজ্ঞ কমিটি, যার শীর্ষপদে ছিলেন পাঞ্জাবের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (পিজিআইএমইআর), চন্ডিগড়-এর অধিকর্তা কে কে তলওয়ার। দু'বছর পরীক্ষা হল। পিজিআইএমইআর দু'বছরে পঁচিশটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে জানাল যে, অন্তত ৬৫ শতাংশ নমুনাতে ডিএনএ মিউটেশন শনাক্ত করা গেছে। জেনেটিক বিকৃতি ঘটাতে পারে, রক্তে পাওয়া যাচ্ছে এমনও নানা উপাদান। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অফ হিউম্যান বায়োলজি স্বতন্ত্র একটি পরীক্ষা করে জানিয়েছে যে, তুলো কিংবা গম চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষিকর্মীদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের ডিএনএ বিকৃতি ধরা পড়েছে।

পিজিআইএমইআর গবেষণাদলের মুখ্য গবেষক ছিলেন জে এস ঠাকুর। তাঁর মতে, এই সমস্ত মারাত্মক বিষক্রিয়ার ফল হবে সুদূরপ্রসারী। যা অবস্থা তাতে দেহের ডিএনএ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা বাড়বে ক্রমশ। বৃদ্ধি পাবে বিকালাঙ্গ শিশু জন্মের হার। পাঞ্জাব হয়ে উঠতে পারে ক্যুবাটাও। হয়তো এখানেও জন্মাবে বিকৃত করোটিযুক্ত অর্ধেক কিংবা সম্পূর্ণ ঘিলুহীন শিশু। গর্ভবতী মহিলাদের 'স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাতের' ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া চর্মরোগ, অন্ত্রের নানা ব্যাধি, ক্যানসার ইত্যাদি তো আছেই। এখনও এই জেনেটিক বিপর্যয়ের সবটা ফুটে ওঠেনি। ভবিষ্যতে হবে। এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছেন ডঃ ঠাকুর।

পাঞ্জাবের জলদূষণ তীব্র আকার নিয়েছে। কথিত এই রাজ্যে মৃত্যুর প্রধান কারণ এখন বিষাক্ত জল। ডোড়া অঞ্চলে দুটি নমুনাতে নাইট্রেটের পরিমাণ পাওয়া যাচ্ছে ৯৪.৩ মিগ্রা/লিটার এবং ৭২.৮ মিগ্রা/লিটার যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য (হু)-র নির্ধারিত মাত্রা লিটারে সর্বোচ্চ ৫০ মিলিগ্রাম। জলে উচ্চমাত্রায় শনাক্ত হয়েছে মার্কারি, কপার, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম বা লেডের মত ভারি মৌল। উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক, যা সংগৃহীত ৭০ শতাংশ নমুনায় উপস্থিত। নিয়মিত এ সমস্ত বিষ জল মারফৎ ঢুকছে খাদ্য শৃঙ্খলে। ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্য মানুষের মধ্যে, কৃষিক্ষেত্র থেকে যারা বহুদূরে।

আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য দিচ্ছে জার্মানির মাইক্রোটেস মিনারেল ল্যাবরেটরি। মালওয়া অঞ্চলের শিশুদের চুলের নমুনায় ইউরেনিয়াম পেয়ে ওরা রীতিমত বিস্মিত। এর ফলে স্থানীয় শিশুদের মানসিক বিকাশ প্রতিহত হচ্ছে। এই অঞ্চলের পাওয়া গেছে ইউরেনিয়াম, লিটারে ২৪৪ মিলিগ্রামের বেশি। যেখানে হু-র নিরাপদ সীমা মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম। এত ইউরেনিয়াম এল কোথা থেকে? হদিস চলছে তার। একদা পাঞ্জাবের এই দূষণ সমস্যা সংসদে উত্থাপিত হয়েছিল। এরপর এক বিশেষজ্ঞ দল এলাকায় সরেজমিনে তদন্ত করে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এলাকার মানুষের অভিযোগ, তারপর আর কোনও দিনই তাঁদের টিকি দেখা যায়নি।

এ এক বিপ্লবের ধ্বংসাবশেষ। ষাটের দশকে নিজেদের স্বার্থে ভারতে সবুজ বিপ্লব রফতানি করেছিল আমেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন, রকফেলার ফাউন্ডেশন, কৃষি দফতর এবং ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএইডি)। তখনই কথা হয় দেশের খাদ্য ভান্ডার হিসাবে গড়ে তোলা হবে পাঞ্জাবকে। আর সেদিনই নিঃশব্দে জারি হয়ে গিয়েছিল কয়েক হাজার পরিবারের মৃত্যু পরোয়ানা। আজকে সেই গুরুভার কাঁধে নেওয়ার খেসারত দিচ্ছে পাঞ্জাব। যে সবুজ সন্ত্রাসের ফল মাটি থেকে খাদ্য, খাদ্য থেকে শরীর, শরীর থেকে দেহ কোষের ডিএনএ - সর্বত্র ঘাতক রসায়নের বিষাক্ত ছোবল। শুধু পাঞ্জাব কেন, যেখানেই সবুজ বিপ্লবের কলা-কৌশল ঢুকেছে, সেখানেই বিষ ছড়িয়েছে, যা নিয়ে কোনও রা নেই কারও। এই পশ্চিবঙ্গের ৮১টা ব্লক আর্সেনিক আর ৪৯টা ব্লক ফ্লোরাইডে আক্রান্ত।

ভোপাল থেকে ভাতিন্ডা। মূল একটাই - সবুজ বিপ্লব। যে প্রবর্তনের পিছনে ভারতের নিজস্ব কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ছিল দায়বদ্ধতা। ছিল হাত পেতে 'ভিক্ষে' নেওয়ার শর্ত। যে শর্তের কাছে গোপনে ভারতের কোটি কোটি জীবন, জল, জমি, জনস্বাস্থ্য বন্ধক রাখা হয়েছিল। আজকের পাঞ্জাব তারই ফসল। ছেষট্টির পর ঝিলম দিয়ে বয়ে গেছে বহু জল। ইতিমধ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী পাল্টেছে আধ ডজনের বেশি। জার্মান প্রাচীর ভেঙেছে, সোভিয়েতের পতন হয়েছে। পৃথিবীর একক সম্রাট হিসাবে উঠে এসেছে আমেরিকা, যদিও অর্থনৈতিক সংকটে তার অবস্থা হয়েছে আরও করুণ। ইতিমধ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মার্কিনি খবরদারি পৌঁছেছে ঐতিহাসিক চূড়ান্ত মাত্রায়, তা সে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় হোক, আর কৃষি জমির দখলদারি হোক। এরা এবার হাজির করেছে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'-এর তত্ত্ব। সেই মোতাবেক স্বাক্ষরিত হয়েছে 'একেআই' চুক্তি - ভয়াবহ দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের নয়া ইস্তাহার। কৃষিতে চুক্তি চাষ, বাণিজ্যিক চাষ আর কৃষি পণ্য রপ্তানি - এই যার লক্ষ্য। যার অর্থ আরও সন্ত্রাস। আরও ধ্বংস। বাস্তুতন্ত্রের আরও বিপদ। এর বিরুদ্ধে চর্চা প্রয়োজন। ভয়াবহ সেই পরিণতির হাত থেকে বাঁচার পথ একটাই - গণ আন্দোলন। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকার অর সময় নেই। এগিয়ে এসে রাস্তায় নামাই একমাত্র উপায়। জঙ্গলে সবুজ শিকার, কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব আসলে কিন্তু এক অভিন্ন কর্মসূচির অংশ।

লেখক সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক

(একদিন, জুলাই ৭, ২০১০)

দ্বিতীয় সবুজ 'বিপ্লবী' শাসক-কর্পোরেটদের চিনুন !

ঠান্ডা ঘরে ছয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে (কিছুদিন পূর্বে কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে অনুষ্ঠিত) দু'দিনব্যাপী কর্মশালার মধ্য দিয়ে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'-এর মহিমা প্রচার করে গেলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং শরদ পাওয়ার। পাশে বসেই তাতে সায় দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কৃষিমন্ত্রী নরেন দে। কিন্তু একটা কথা একবারও উচ্চারিত হল না যে, এই 'বিপ্লব' আসলে একটা কর্পোরেট 'সবুজ লুন্ঠন' পরিকল্পনা, যার মূল ভিত্তি ২০০৫ সালে ভারত-আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত দেশবিরোধী 'একেআই'। এর ব্যাপ্তি কৃষি উৎপাদন, বন্টন থেকে গৃহস্থালীর হেঁসেল - শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিষেবা বাণিজ্য সর্বত্র প্রসারিত। এক কথায় গোটা অর্থনীতিটাই গিলে খাবে এই একেআই চুক্তি।

আমরা যারা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে একসাথে রাস্তায় হেঁটেছিলাম, কেমিক্যাল হাব স্থাপনের বিরোধীতা করেছিলাম, সেজের বিরুদ্ধে ও হরিপুরে পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলাম, তাদের সবাইকে জানানো দরকার, এই ভয়ঙ্কর কর্মসূচি রূপায়ণের অর্থ একটা সিঙ্গুর, একটা নন্দীগ্রাম, একটা নয়াচর কিম্বা একটা হরিপুর নয়। হাজারটা সিঙ্গুর, হাজারটা নন্দীগ্রাম, হাজারটা হরিপুর, হাজারটা ভোপাল কিম্বা হজারটা বিদর্ভ। কৃষি, শিক্ষা,গবেষণা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এমন কিছুই নেই, যা 'একেআই' চুক্তির আওতায় পড়ছে না। দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের তুলনায় একটা সিঙ্গুর তো নস্যি।

সত্যটা জানুন : সন্তর্পনে একটা কথা চেপে যাওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে না এই 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'-এর ভিত্তি ২০০৫ সালে সাক্ষরিত ভারত-মার্কিন একেআই (AKI) চুক্তি, যার সম্পূর্ণ নাম নলেজ ইনিটিয়েটিভ অন অ্যাগ্রিকালচার, এডুকেশন,ট্রেনিং, সার্ভিসেস অ্যান্ড কমার্শিয়াল লিঙ্কেজেস (India-US Knowledge Initiative on Agriculture Education, Research, Services and Commercial Linkages)। ২০০৫ সালে (জুলাই ১৮) প্রধানমন্ত্রী (মনমোহন সিং) আমেরিকায় (প্রেসিডেন্ট বুসের সাথে আলেচনায়) বসে এই চুক্তিতে সই দিয়ে বলেছিলেন - একেআই চুক্তি 'সবুজ বিপ্লবের অগ্রদূত' (harbinger of second green revolution)। এই চুক্তির আসল কারিগর আমেরিকার কৃষি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি। এরা ভারতের উর্বর জমির দখল নিয়ে চুক্তিতে নিজেদের প্রয়োজনমত ফসল ফলিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে চায়, যার সাথে ভারতীয় নাগরিকদের খাদ্য নিরাপত্তার কোন সম্পর্কই নেই। 'খাদ্য নিরাপত্তা'র প্রচার আসলে এক ভাঁওতা।

কৃষক নয় - এই বিপ্লবের (!) মূলে কর্পোরেট : এটা ভাবতে লজ্জা হয় আমেরিকার মনস্যান্টো, আর্চার ড্যানিয়েল মিডল্যান্ড (এডিএম) এবং ওয়ালমার্ট - অতি মুনাফাবাজ এই তিনটে কোম্পানির বিশ্ব-বাণিজ্যনীতি ভারতের মত একটা স্বাধীন দেশের কৃষিনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই তিন তারকাই ভারতে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব'-এর নেপথ্য নায়ক, যারা প্রত্যেকে এই 'একেআই' বোর্ড সদস্য। লক্ষণীয়, এই মনস্যান্টো কোম্পানি বিশ্বের একনম্বর কৃষি রসায়ন ও বীজ কোম্পানী। এডিএম সর্ববৃহৎ খাদ্যপণ্য বিক্রেতা। আর ওয়ালমার্ট তো বিশ্বের খুচরো বাজার গিলে খাবার একচেটিয়া বোয়াল মাছ, যে কোম্পানির বার্ষিক আয় নিম্ন আফ্রিকার সমস্ত দেশের জাতীয় আয়ের চাইতেও বেশী। এই চুক্তি কার্যত কৃষি উপকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং খুচরো ও পাইকারি ব্যবসার একচেটিয়া কারবারিদের এক অশুভ আঁতাতের ফলশ্রুতি, যার সাথে দেশজ দোসর হিসাবে জুটেছে টাটা, মিত্তাল, আম্বানি, গোয়েঙ্কারা। দেশবাসীর কাছে ওরাই কোম্পানিগুলির স্বদেশী মালিক।

এই চুক্তির ফলে কী কী হচ্ছে ও হবে : এই একেআই চুক্তি মেনেই দেশের কৃষি ও খুচরো ব্যবসায় বৃহৎপুঁজির প্রবেশ ঘটছে। রাজ্যে রাজ্যে বদলে নেওয়া হচ্ছে এপিএমসি আইন (Agricultural Produce Market Committees Act), যার ফলে এখন সমস্ত রাঘব বোয়ালরা সরাসরি চুক্তিচাষে ঢুকে পড়েছে, নিজেদের পছন্দমত চাষ করাচ্ছে - পাঞ্জাব, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক সহ অন্যত্র। দেশের বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রগুলিতে বিদেশী কোম্পানীগুলি ঢুকে পড়েছে - সেখানে বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে শংসাপত্র লিখিয়ে নিচ্ছে, বিটি বেগুনের ক্ষেত্রে যা প্রমাণিত। এই চুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে মনস্যান্টোর মত বীজ ও রসায়ন কোম্পানিগুলি যাতে বীজের বাজারে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে পারে সে জন্যে আসছে বীজ আইন (Seed Bill 2010)। কৃষকের হাত থেকে বীজ সংরক্ষণ ও বিনিময়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। কোম্পানী বীজ ছাড়া অন্য কোনও বীজ যেন চাষ করা না যায় তার ব্যবস্থা পাকা হচ্ছে। আগাম বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন বদলে নেওয়া হয়েছে - তাই বিশ্ববাজারের সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে হু হু করে। আগামী দশকে খাদ্যবণ্যের দাম যে আরও বাড়বে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নানা রিপোর্টে তা জানিয়েছে। কৃষিদ্রব্য মানেই এখন খনিজ সোনা - ফাটকাবাজরা তাই খাবারের বাজারে বিনিয়োগ করে মূল্য আরও চড়িয়ে দিচ্ছে। যার ছিটেফোঁটাও কৃষক পাবে না, সিংহভাগটাই যাবে অতিদানব এই সমস্ত উঠতি মধ্যস্বত্বভোগীদের পেটে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ধান, গম ইত্যাদি চাষের এলাকা কমানো হবে। বাড়ানো হবে সবজি ও ফলের চাষ, যা প্রক্রিয়াকরণের পরে পাড়ি দেবে বিদেশে।

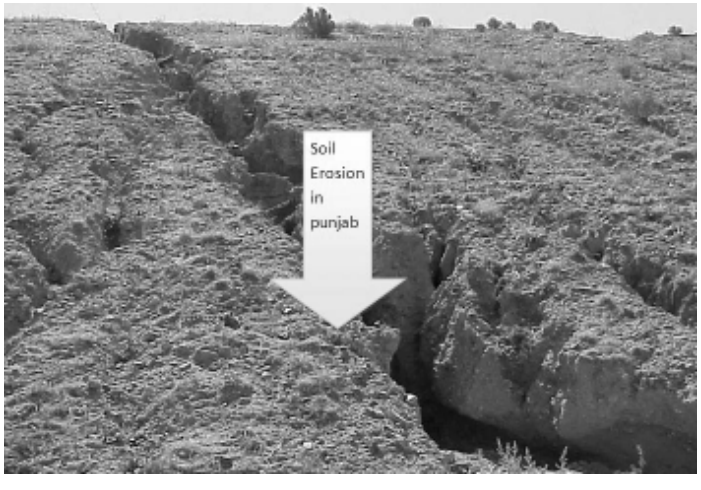

একেআই চুক্তির আদলে দেশের জাতীয় কৃষিনীতি তৈরী হয়েছে। কিন্তু সেখানে কৃষকদের কোন সমস্যা নিয়েই আলোচনা হয়নি। গোটাটাই কর্পোরেটদের চাহিদা অনুযায়ী সাজানো। এমন ছক কষা হচ্ছে যে তার ফলে কৃষির খরচ এত বাড়বে যে সাধারণ কৃষক আর চাষ করতে পারবে না, জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এ হল উচ্ছেদের নতুন কৌশল।

আজও যখন বিশ্বজুড়ে খাদ্যসংকট বাড়ছে, তখন পৃথিবীজুড়ে উর্বর কৃষিজমি নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে আন্তর্জাতিক খাদ্য এবং পণ্য কারবারিরা। পঞ্জাবে ইতিমধ্যেই গ্রামের পর গ্রাম দখল হয়ে গেছে। সেখানে পশুখাদ্য তৈরী হয়ে পাড়ি দিচ্ছে বিদেশে আর স্থানীয় মানুষ এবং পরিবেশ বিষে নীল হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এর ফল হয়েছে ভয়াবহ। দেনার দায়ে সারা দেশে আত্মহত্যা করেছে হাজার হাজার কৃষক। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত দেশে ১,৮২,৯৩৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন, অর্থাৎ গড়ে প্রতি ৩০ মিনিটে ১ জন।

রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান : ভারত-মার্কিন চুক্তি মেনে, কৃষক তথা আমজনতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, ভূমিসংস্কারের বিপরীত পথে হেঁটে আজ যখন দেশের কৃষি ও বাণিজ্যনীতির আমূল রদবদল করা হচ্ছে, কর্পোরেটের অঙ্গুলিহেলনে পালটে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক আইন, তখন ডান-বাম নির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলি একেআই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে। ১২৩ পরমাণু চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখন বাম দলগুলি বলেছিল এর ফলে দেশের সার্বভৌমত্ব রসাতলে যাবে। অথচ তার চাইতেও হাজার গুণ ভয়ঙ্কর যে কৃষি জ্ঞান চুক্তি, তা নিয়ে তারা টুঁ শব্দটি করল না। দেশবাসীর অন্নদাতাদের বিরুদ্ধে এতবড় একটা চক্রান্ত সংগঠিত হচ্ছে, যার ফলে দেশের খাদ্য-নিরাপত্তা ভয়ঙ্কর রকমের বিপর্যস্ত হবে, তখন সরকারি জমিতে সরকারি খরচে একের পর এক হিমঘর স্থাপন করে তা তুলে দেওয়া হচ্ছে একচেটিয়া কারবারিদের ফসল সংরক্ষণের জন্য, যাতে তাদের বাড়তি মুনাফা নিশ্চিত হয়। অন্যদিকে সমস্ত কৃষিসম্পদ লুট করে নিয়ে যাবার জন্য বসছে রেলের পণ্য করিডোর। ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক। এ এক আশ্চর্য চক্র - পিপিপি। অর্থাৎ, মুনাফা ওদের - জল, জমি মেহনত ও খরচ আমাদের।

প্রথম সবুজ বিপ্লব : ইতিমধ্যেই সরকার, এমনকী ভারতে প্রথম সবুজ বিপ্লবের মূল প্রবক্তা স্বামীনাথনও স্বীকার করেছেন - প্রথম সবুজ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই ব্যর্থতার মূল্য দিচ্ছে কারা ? প্রথম সবুজ বিপ্লবের আঁতুড়ঘর পাঞ্জাব। যাকে গর্ব করে বলা হত 'ব্রেড বাস্কেট অফ ইন্ডিয়া, বা ভারতের খাদ্যভান্ডার। আজ সেই পাঞ্জাব ভারতের ক্যান্সার বেল্ট। চালু হয়েছে ক্যান্সার এক্সপ্রেস - ভাতিন্ডা থেকে বিকানির। ট্রেন নম্বর ৩৩৯। কোনও পরিবারের দশজন - দশজনই আক্রান্ত জলে, মাটিতে বিষ। বিষাক্ত বাতাস। যে সমস্ত অঞ্চলে মনস্যান্টো, কার্গিলের মত কর্পোরেটরা ঢুকছে সেই অঞ্চলগুলোই পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে। কাজেই ব্যর্থতা মানে শুধুমাত্র ফসলের উৎপাদন হ্রাস নয় - ব্যর্থতার মূল্য সুদূরপ্রসারী। যেমন এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ৩৪১টা ব্লকের মধ্যে ৮১টা ব্লক আর্সেনিক আর ৪৯টা ব্লক আক্রান্ত ফ্লোরাইডের বিষে। বাংলায় আগে চাষ হত ৫০০০ প্রজাতির ধান। এক বিপ্লবের ধাক্কায় যেখানে ৪৫০০ প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে গেছে। তখন বিজ্ঞানীদের দিয়ে বলানো হয়েছিল 'সবুজ বিপ্লব' কৃষকের ঘরে ঘরে এনে দেবে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি, যা পরে তাদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে চলে গেছে। ছোট ভৃষক বড় কৃষকের হাতে জমি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। কমে গেছে মৌমাছি, হারিয়েছে জীববৈচিত্র - যার অর্থ গরিব মানুষের খাবার টান পড়া। দ্বিতীয় বিপ্লবে এই সংকট আরও তীব্র আকার নেবে। হয়ত গোটা পূর্বাঞ্চলটাই যুক্ত হবে ক্যান্সার বেল্টে। এই পথ প্রশস্ত করতেই আজ ভুল স্বীকারের কৌশল দ্বিতীয় 'বিপ্লব'-এর প্রচারে স্বামীনাথনের শশব্যস্ততা।

কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভাতে মারার পরিকল্পনা : 'দ্বিতীয় সবুজবিপ্লব' আসলে কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীসহ কয়েক কোটি মানুষকে ভাতে মারার পরিকল্পনা। কৃষি, পরিবহন, বন্টন, খুচরো ও পাইকারি ব্যবসা তথা বাজার ব্যবস্থা - সবটাই গিলে খাবার এক ভয়ঙ্কর এই পরিকল্পনার পক্ষে যারা ওকালতি করছেন, তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে একটা দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। এর বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণেরই সরব হওয়া প্রয়োজন।

- *একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ (ফামা) কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপত্রের মূল বক্তব্য প্রকাশ করা হল। অধিকাংশ বন্ধনী আমাদের সংযোজন।*
- *আগামী সংকলনে একেআই চুক্তি, এপিএসসি অ্যাক্ট ও বীজ বিল ২০১০-এর উপর আলোকপাত করা হবে।*

পরিবেশের অধিকার

■ পার্থসারথি দাশ ■

মাটি-জল-বায়ু-এলাকার রাস্তাঘাট, নদী-নালা-খাল-বিল, মানুষ-পরিজন - এসব নিয়েই আমাদের পরিবেশ। একটি শিশু যখন এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার বেঁচে-বেড়ে ওঠার জন্য একটি নির্মল পরিবেশ প্রয়োজন হয়। বুকভরে সে যেন প্রাণদায়ী নির্মল বাতাস শ্বাস নিতে পারে, চোখভরে যেন নিতে পারে সবুজের সতেজ আশ্বাস। তবেই একটি শিশু ভাবী দিনে সুস্থ, সবল ও মনুষ্যত্বে উজ্জ্বল একজন যথার্থ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে।

কিন্তু সভ্যতার ও অগ্রগতির নামে আমরা ও আমাদের সরকারি নেতারা পরিবেশকে সামগ্রিকভাবেই শিশুর বাসের অযোগ্য করে তুলছে ক্রমাগত। পরিবেশের তোয়াক্কা না করে পরিবেশদূষণকারী নানান কলকারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। কলকারখানার দূষিত বর্জ্য নদীতে ফেলে নদীর জলকে ক্রমাগত বিষাক্ত করে তোলা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পরিবেশদূষণকারী বলে উন্নত দেশগুলি যেসব শিল্পকে বর্জন করেছে, আমাদের দেশের ও রাজ্যের শাসকগোষ্ঠির নেতারা তাদেরকে ডেকে এনে সর্বনাশ ঘটাতে বদ্ধপরিকর। পূর্ব মেদিনীপুরের নয়াচরে কেমিক্যাল হাব করার অনুমোদন নাকি পাওয়া গেছে। অথচ ঐ কেমিক্যাল হাবের বর্জ্য নদীতে পড়লে নদীর জল প্রাণহীন হয়ে পড়বেই। মাছ না থাকলে মৎস্যজীবি লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা হারাবে। এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষ মারণরোগের শিকার হবেই। শিল্পপতিদের কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা কাটমানি পকেটে ভরে পার্টি চালানোর খেলায় দেশের মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনছে সরকারি কর্তরা। নতুবা এ গোঁয়ার্তুমি কেন? জাপানের মিনামাটা ও ব্রাজিলের ক্যুবাটাও একসময় রসায়ন শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই রসায়ন শিল্পনগরী কিছুদিনের মধ্যেই ভয়াবহ মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল।

বি এ এস এফ, দ্যুঁপ, ডাউ, মনস্যান্টো, মিৎসুবিশির-র মত গোটাকয়েক বহুজাতিক সংস্থা বিশ্বের রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এরা যেমন বিশ্বের মানুষকে রাসায়নিক পণ্যনির্ভর করে তুলেছে, তেমনি তাদের রাসায়নিক উৎপাদন কারখানার বর্জ্য ক্রমাগত মাটি-জলকে বিষিয়ে তুলছে। কেমিক্যাল হাবের মূল সমস্যা হল বিষাক্ত অপরিমেয় বর্জ্য - যা পারমানবিক বর্জ্য অপেক্ষা কোন অংশে কম মারাত্মক নয়। জীবকুলকে যুগ যুগ ধরে পঙ্গু, স্থবীর ও বিকলাঙ্গ করে জন্ম দেবে, মানসিক ভরসাম্য হারাবে কোটি কোটি মানুষ আর নানা জীব। ইটালির সেভেসো শহরের ডাই-অক্সিন গ্যাস দুর্ঘটনা, ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপের সিকোডাস অঞ্চলে হাজার হাজার টন ডিডিটি উৎপাদনের ফলে যে বিপর্যয় ঘটেছে সেগুলো কারুর অজানা নয়।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কোটি কোটি বিনিময়ে শিখন্ডী খাড়া করে মানুষের সর্বনাশ সাধনে ব্রতী হয়েছে। কাঁথির হরিপুরে উন্নত দেশগুলির প্রত্যাখ্যান করা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র করার অনুমোদনও কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে এর সর্বনাশা প্রভাবের সঙ্গে বহু গ্রামের মানুষ, মৎসজীবি বাস্তু হারাবে,জীবিকা হারাবে, পরমাণু বর্জ্যের প্রভবে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। রাশিয়ার মত সমৃদ্ধ দেশও পরমাণু বর্জ্যকে নিরাপদে রাখতে পারেনি। আর আমাদের দেশের ঘুষখোর রাজনৈতিক নেতারা মানুষের জীবনকে সুরক্ষিত রাখবে - একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?

যাঁরা, একাধিক মানবপ্রেমী পেটেন্ট সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সেই বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. শিবনাথ মাইতি মাত্র ছ'একর জমিতে ১২ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ তৈরি করার টাওয়ার প্রজেক্ট করেছেন - যার বিদ্যুতের খরচ ইউনিটপিছু এক-দু'পয়সা হবে মাত্র এবং এই পদ্ধতি অত্যন্ত পরিবেশবান্ধব হবে। টাওয়ার বসানোর প্রাথমিক খরচ ছাড়া অন্য কোনো খরচ প্রায় লাগবে না। সেক্ষেত্রে বাধা কোথায়?

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক বিষ, সার, মনস্যান্টো কোম্পানীর জিনসিড, বিটি বেগুন ইত্যাদি মানুষ ও পরিবেশকে ক্রমাগত মৃত্যুমুখী করছে। দেশে নিবিড় বনায়ন-এর মাধ্যমে মাটি-জল-বাতাস-সামগ্রিকভাবে নির্মল পরিবেশ গড়ে দূষণের হাত থেকে জনসমাজকে বাঁচানোর চেষ্টা হোক। নির্মল পরিবেশ আমাদের জন্মগত অধিকার।

''মিনামিতা রোগ''

পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে জাপানের এক সমুদ্র তীরবর্তী শহর মিনামিতা-য় বসবাসকারীরা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষ্য করে - তাদের বিড়ালগুলো মাতালের মত আচরণ করছে, যাকে তারা অজ্ঞতাবশে নাম দেয় ''dancing cats'' বা ''নাচনি বিড়াল''। আসলে মস্তিষ্কে বিষের প্রভাবে (methyl mercury poisoning) আঘাতজনিত কারণে বিড়ালেরা এমন আচরণ করছিল। ক্রমে মানুষও এ রোগের শিকার হয়। একটি রাসায়নিক কারখানা (Chisso Chemical Plant) মিনামিতা উপসাগরে যে পারদমিশ্রিত বর্জ্য ফেলত তাতে আক্রান্ত জলজ প্রাণি (যেমন মাছ) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করায় এই রোগের (শহরের নামে যা পরে ''মিনামিতা রোগ'' নামে পরিচিত হয়) প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্রে গোলযোগ, মাথাধরা, পেশীর উপর নিয়ন্ত্রণহীনতা, এমনকী আত্মহত্যার প্রবনতাও দেখা দেয়। শিশুরা জন্মায় শারীরিক-মানসিক বিকলাঙ্গ হয়ে। ছোট্ট শহরের প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ আক্রান্ত হয় ও মারা যায় ৫০ জন। কুড়ি বছর ধরে প্রতিবাদ আন্দোলনের পর ঐ কোম্পানী শেষপর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এটাই সম্ভবত আধুনিক বিশ্বে প্রথম জলদূষণজনিত ঘটনার উদাহরণ। আজও সেখানে আনেকে এই রোগে ভুগছে।

সমপথ

নির্বাচিত রচনা সংকলন

বিনিময় - পনেরো টাকা

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯

প্রাসঙ্গিক কথা

বিনিময় - দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

ওয়েবেন কার্যালয়

৬০এ/২ ব্যানার্জীপাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৩১

দূরভাষ : ০৩৩ ২৪০৫ ৫৩৩৪

রবি রায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৪ *অনুদান : ২ টাকা*

কেবলমাত্র সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে বিতরণের জন্য